Registered

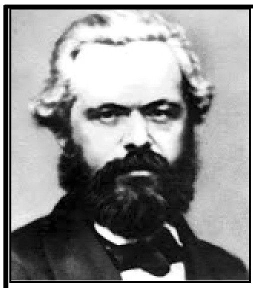

(জন্ম : ৫ মে, ১৮১৮)
কার্ল মার্কস লাল সেলাম॥

গণবার্তা

সম্পাদকীয়	১
তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি'র আঁতাত	১
দেশে-বিদেশে	২
ফ্রান্স : শ্রম আন্দোলনের সাতকাহন	৩
স্বৈরতন্ত্র সততই ষড়যন্ত্র নির্ভর	৫
মে দিবস কিছু কথা	৬
আন্তর্জাতিক মে দিবস	৭
রানাঘাটে লেনিনের জন্মদিবস পালন	৮
কেন্দ্র রাজ্যকে নিশানা আরএসপি'র	৮

70th Year 29th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 29th April 2023

সম্পাদকীয়

মে দিবস ঃ গণ অভ্যুত্থান ও বিকল্প ক্ষমতার সন্ধান

'মে দিবস' শুধুমাত্র দেশে দেশের শ্রমজীবী জনতার আবেগের মুহূর্তের প্রথাগত স্মৃতিচারণের উৎসব নয়। ১৮৯০ সালে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর চতুর্থ জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় মে দিবসের আন্তর্জাতিক গুরুত্বের কথা বিশ্লেষণ করে এঙ্গেলস বিশ্বের শোষিত মানুষের মুক্তির অঙ্গীকার ঘোষণা করেছেন। তিনি সেদিনের মে দিবসে ইউরোপ আর আমেরিকার সর্বহারা শ্রেণির আট ঘণ্টার কাজের দাবির সংগ্রামে দেশে দেশে পুঁজিপতি ও জমির মালিকদের শঙ্কিত হতে দেখেছেন। তাঁর আক্ষেপ সহযোদ্ধা মার্ক্স দুনিয়াজুড়ে শ্রমজীবী জনতার এই অভূতপূর্ব উত্থান দেখে যেতে পারেন নি।

এঙ্গেলসের নেতৃত্বে ১৮৯৩ জুরিখে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ঘোষণা, মে দিবসে দুনিয়ার সর্বহারা শ্রেণির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পরিসর শুধু শ্রমিক কর্মচারীদের কাজের ঘণ্টা হ্রাস ও অন্যান্য দাবি দাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। মে দিবসের সংগ্রাম শ্রেণি বৈষম্যের অবলুপ্তি এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দায়বদ্ধ থাকবে।

আজ 'মে দিবস' এই শ্রেণি সংগ্রামের ঐতিহাসিক চড়াই উৎরাই এর আলোকে পুঁজিবাদ উচ্ছেদে প্রত্যয়শীল প্রতিটি দল ও সংগঠনের কাছে আত্মবিশ্লেষণের মুহূর্ত। একথা অনস্বীকার্য মরনোন্মুখ পুঁজিবাদ ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পর শ্রমপুঁজির দ্বন্দ্বের নিরিখে বার বার বদলে নিয়েছে পথ। কখনো শ্রমপুঁজির আপস, কখনো প্রযুক্তির দ্রুত রূপান্তর, কখনো দুর্ভিক্ষ বা যুদ্ধ কেন্দ্রিক অর্থনীতির ওপর ভর করে ভস্মের মাঝেও বার বার মাথা তুলে দাঁড়ায়।

২০০৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ইউরোপ আমেরিকার লগ্নিপুঁজির সংকটের মাঝে সাময়িকভাবে রাজনৈতিক পরিসরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও লাতিন আমেরিকার মানুষ। সংসদীয় বাম হোক আর সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সমাজতন্ত্রী রাজনৈতিক শক্তি হোক নতুন করে আশা জাগিয়েছিল শোষিত মানুষর মনে। ২০১৫ সালে গ্রীসে সিরিজা, স্পেনে পেডোমস, ব্রিটেনে জেরেমী করবিন অথবা আমেরিকায় বার্নি সেন্ডার্সকে ঘিরে জঙ্গি বামশক্তি আশায় বুক বেঁধেছিল। কিন্তু সেই আশা ক্ষণপ্রভার মতো মিলিয়ে গেছে। লাতিন আমেরিকায় অবশ্য কিছুটা ব্যতিক্রমী ধারায় ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে চলছে আগ্রাসী পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রাম।

তাই ইতিহাসের মুখোমুখি আজ এক চরম রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ এসে দাঁড়িয়েছে। গণ আন্দোলনের সমর্থনের ভিত্তিতে প্রচলিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংসদীয় নির্বাচনের মাধ্যমে বামপন্থীরা ক্ষমতাসীন হলে কি সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সম্ভব? শ্রমজীবী জনতার সংকটের ইতিহাস কিন্তু এই প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তরই দেয়। বাস্তবে প্রতিক্রিয়ার আধিপত্যের ট্র্যাজেডীই ঘুরে ঘুরে এসেছে।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্স ও গ্রামসির ব্যাখ্যা ভুলে গেলে চলবে না। রাষ্ট্র সাংগঠনিক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বিশেষ আদর্শ নির্ভর জ্ঞানকেন্দ্রিক নাগরিক উপাদানের সহায়তায় শোষিত শ্রেণির উত্থানের শর্তগুলি অস্বীকার করে, ধ্বংস করে। পুঁজির সঞ্চয়নের পুনর্নির্মাণের পুষ্টিই তার লক্ষ্য। প্রয়োজনে সীমান্ত, বর্ণবৈষম্য, সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও বিভিন্ন 'অপর' ও বন্দীশিবির নির্মাণ তার রণকৌশল।

এযাবৎকাল 'নয়াউদারবাদ' বা 'বিশ্বায়ন বিরোধী' সংগ্রামসমূহে শোষিত শ্রেণির চেতনা ও সামাজিক গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিস্পৃহতা বা অজ্ঞানতা ব্যপ্ত ছিল। বিকল্প রণনীতির কথা ভাবেনি। কতটা সংঘাতের শক্তি অর্জন করলে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা যায় সেই ধারণার লেশ মাত্র ছিল না। এই সব ব্যর্থতার নিরিখেই বিকল্প রণনীতির, সংঘর্ষ ও নির্মাণের বিতর্কগুলি চালিয়ে যেতে হবে।

রাষ্ট্রবিরোধী গণআন্দোলনের পরিসরে বামপন্থীরা যেন তাঁদের ভাবনায় অভ্যাসে দেখা শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে না আসেন। নিম্নবর্গ তথা শোষিত শ্রেণির শিকড় থেকে উদ্ভুত শ্রেণি আন্দোলনের রণনীতির বিকল্প পথ অন্বেষণ করেন। মার্ক্সের ফায়ারবাখ সম্পর্কিত তৃতীয় সূত্রের থেকে পাঠ নিয়ে, নেতৃত্ব ভ্যানগার্ড বা এডুকেটরদেরই এডুকেটেড হতে হবে। অর্থাৎ কিভাবে নতুন সামাজিক- অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের সংগ্রামগুলি এগিয়ে চলে তা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। কিভাবে তাদের যৌথ চেতনায় বিকল্পের সম্ভাবনা ফুটে উঠছে তা অনুধাবন করেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি'র গভীর আঁতাত। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ছলনা

মাত্র কয়েকমাস আগে ভারতের বর্তমান শাহেনশাহ নরেন্দ্র মোদির অতি বিশ্বস্ত সাঙ্যাৎ এবং দেশের বর্তমান মহাশক্তিধর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর কলকাতা ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই রাজ্যে বিজেপি'র সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা। তিনি রাজ্যের বিজেপি নেতাদের সভায় উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন দলের সাংগঠনিক ভিত্তির বিশেষ দুর্বলতা প্রসঙ্গে।

বর্তমান বিজেপি নেতৃত্ব উপলব্ধি করছেন যে, বিগত প্রায় এক দশক জুড়ে মোদির স্বৈরশাসন দেশের বহু মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। মোদি সরকার কোনভাবেই তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নতির পথে দেশের জনজীবনকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। প্রকারান্তরে বিগত দিনগুলিতে সমস্ত জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে লাগামহীনভাবে। সাধারণ মানুষের জীবন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চাপে বিপর্যস্ত। আয় বা উপার্জন কোনভাবেই বাড়েনি। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীনভাবে পেট্রোল ডিজেল কেরোসিন তেল ও রান্নার গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব। বিশ্ব বাজারের অজুহাত দিয়ে পেট্রোজাত সমস্ত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি মানুষ মেনে নিতে পারছেন না। পরিবহণ মূল্য ইদানীংকালে এত বেশি বেড়ে যাবার ফলে জিনিসপত্রের দাম সাধারণ ভোক্তার কাছে বিশেষ সমস্যার উদ্রেক করেছে। ভারতে অদূর অতীতে মূল্যবৃদ্ধি এমন বিরূপ প্রভাব ফেলে নি। মোদি সরকারের এ প্রসঙ্গে কোনও হেলদোলই নেই। কোনও তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়ে পরিস্থিতি মনুষ্যজীবনের অনুকূল করার সামান্যতম উদ্যোগও মোদি সরকার নিতে পারে নি।

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা শুধুমাত্র এক্ষেত্রেই সীমিত নেই। দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি পূর্ণত বিপর্যস্ত হবার জন্য কর্মহীনতা বা বেকারত্বের সমস্যা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে এই চলমান সমস্যাটি এমন উৎকট রূপে কখনোই যুবজীবনকে ত্রস্ত করেনি। মোদি প্রতিশ্রুত বছরে দু'কোটি চাকুরির সংস্থান একটি ট্র্যাজেডিতে পরিণত। বিগত এক দশকে মোদি সরকার বিশ্বায়িত অর্থনীতির সঙ্গে একাত্ম হবার জ্ঞানশূন্য বাসনায় ভারতের প্রায় সবকটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি করে দিয়েছে। কত কম দামে সরকার ঘনিষ্ঠ পুঁজিপতিরা এইসব সংস্থাগুলির মালিকরা পেয়েছে তা একমাত্র বিবেচ্য নয়। দেশের জনসাধারণের কষ্টার্জিত অর্থে এইসব সংস্থাগুলি গড়ে উঠেছিল। সংস্থাগুলির পরিচালন ব্যবস্থা কতটা যথাযথ ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে। কিন্তু ১০০ শতাংশ জনগণের সম্পত্তি মাত্র ৩৭-৩৮ শতাংশ ভোটে বিজয়ী মোদি সরকার কিভাবে নিল? এটা বৈধতা এবং নৈতিকতার প্রশ্ন। ভোটে জিতে মসনদ দখল করতে পারলেই শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সবকিছু করা যায় না।

এসব প্রসঙ্গ নিয়ে বিতর্ক অবশ্যই আছে এবং থাকা উচিৎ। কিন্তু যা, অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ তা অবশ্যই এতগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে যত সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারী জীবিকা অর্জন করতেন তাঁদের অবস্থা অতীব করুণ হয়ে উঠেছে। নতুন করে চাকুরির সম্ভাবনা বিলীন হয়েছে। যাঁরা আছেন তাঁদের আর কোনও নিরাপত্তাই থাকছে না। মোদি সরকার নিঃসন্দেহে শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যূনতম স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতেও কুণ্ঠিত নয়। এই সরকার একান্তভাবেই পুঁজিপতিদের এবং নির্দিষ্ট করে উচ্চারণ করলে আদানি-আম্বানি প্রমুখের সরকার। সাধারণ মানুষের জীবনের কোনও প্রকৃত সমস্যাই এই সরকারের কাছে মূল্যহীন। কানাকড়ি মূল্যও নেই।

অবশ্যস্বীকার্য, মোদি সরকারের এমন সব অমানবিক কার্যাবলি ভুক্তভোগী মানুষ ভালভাবে নেবেন না। অযোধ্যায় কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে 'রামমন্দির' নির্মাণের মহোৎসবের লাগামছাড়া প্রচার হোক্। ভুখা পেট কেন মানবে এসব? হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কৃত্রিম বিভাজন এবং লাগাতার বৈষম্য কি আর চরম শ্রেণিগত বৈষ্যম্যের বাস্তবতা গোপন করতে পারবে? দেশের কোটি কোটি কৃষক বা কৃষিকর্মে যুক্ত মানুষদের ফসলের দাম না পাওয়ার বেদনা কীভাবে দূর করবে মোদির দল বা আর এস এস!

২০২১ সালে সম্মিলিত কৃষক আন্দোলনের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল অতি উদ্ধত ও দুর্বিনীত নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং। কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ফাটল ধরানোর সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। হিন্দু মুসলমান বিভাজন কোনও কাজেই অসেনি। কৃষক সম্প্রদায় অনড় ছিলেন তাঁদের মৌলিক দাবিতে। এসবের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল MSP অর্থাৎ, বহু ব্যয়ে উৎপাদিত ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য। কৃষি উৎপাদনে বিশ্বায়নের বিষফল হিসেবে সার (রাসায়নিক ও জৈব উভয়ই) জল, বিদ্যুৎ, ডিজেল পরিবহণ ব্যয় বিগত বছরগুলিতে মাত্রাহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অত্যধিক বেশি খরচ করে কৃষি উৎপাদনের লাভজনক দাম না পেলে কোটি কোটি মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়। বেশ অনেককাল যাবৎ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে সংখ্যায় কৃষক আত্মহত্যা বেড়ে গেছে তার অন্যতম কারণ হিসেবে কৃষি উৎপাদনে বারংবার ক্ষতির বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

সাত শতাধিক কৃষক ও কৃষিকর্মী দীর্ঘ আন্দোলনে শহিদ হয়েছেন। জলকামান, টিয়ারগ্যাস, লাঠি চলেছে নির্বিচারে। কিন্তু কৃষক আন্দোলন দমন করা মোদি সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অনৈতিকভাবে চালু করা তিনটি কৃষি সংক্রান্ত আইন নিঃশর্তে প্রত্যাহার করার দাবির সঙ্গেই MSP র দাবিটি বিশেষ মর্যাদা পায় সারাদেশের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে। আন্দোলন প্রত্যাহৃত না হলে উত্তরপ্রদেশ সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে যে নির্বাচনী ফলাফল বিপরীত হতে পারে এই বোধটি মোদি এবং তাঁর দলবলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সুতরাং, মোদি কিছুটা বাধ্য হয়েই কৃষক নেতাদের কাছে নত হবার ভান করলেন। বিশেষ তিনটি আইন প্রত্যাহৃত হল। MSP বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। অগণিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নরেন্দ্র মোদির পরিচয় এখন 'জুমলাবাজ'। মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে

—এরপর ৮ পাতায়

ডারউইনের বিবর্তন বাদ, পাঠ্যক্রম থেকে বাদ পড়ল

N C E R T র নয়া বিদ্যালয় পাঠ্যক্রম থেকে চার্লস ডারউইন-এর বিবর্তনের তত্ত্ব ছেঁটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। "বলা বাহুল্য N C E R T র সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান চেতনাকে অস্বীকার করার এক স্থূল প্রয়াস মাত্র। ডারউইনের বিবর্তনবাদ পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া হলে আগামী প্রজন্ম জীবসৃষ্টি এবং বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আলোকে আলোকিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কারে জারিত করা সহজ হবে। পৌরাণিক আখ্যানে বর্ণিত নানা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপকে ঐতিহাসিক বাস্তব সত্য বলে চাপিয়ে দিতেও কোনও অসুবিধা হবে না। বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং আবিষ্কারগুলিকে অস্বীকার করে মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে সারা বিশ্ব জুড়ে। শূন্যস্থান পূরণের জন্য মানুষের মননে ধর্মের ভয়কে সংগঠিত করে শ্রেণি শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের আন্দোলন দমন করার কাজটাও অনেক সহজ হবে।

N C E R T র এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সম্প্রতি বিজ্ঞানীদের এবং অধ্যাপক সমাজের একাংশ বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন কলকাতায়। মৌলবাদীদের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে একটা দুটো মিছিল নয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক শক্তিগুলির বৃহত্তর যৌথ আন্দোলন প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, গত শতাব্দীতে নাৎসি পার্টি জার্মানীতে সমাজের অগ্রগতির ধারা অবরুদ্ধ করার যে চক্রান্ত করেছিল, তারই অনুকরণে ভারতেও উগ্র ধর্মান্ধতার অন্তত ছায়া বিস্তারের অপচেষ্টা চলছে। N C E R T তথা বর্তমান শাসক শ্রেণি সংবিধানকে অস্বীকার করে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের কাজে লাগাতার বাধা সৃষ্টি করে চলেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা আপাতত আন্তর্জাতিক আদালতের সদস্য পদ প্রত্যাহার করছেন না

International Criminal Court এ বছরের মার্চ মাসে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করেছিল, পুতিনের বিরুদ্ধে ICC র অভিযোগ পুতিন ইউক্রেনে অধিকৃত অঞ্চল থেকে শিশুদের বলপূর্বক অন্যত্র স্থানান্তরিত করেছে। মাতা পিতা বা নিকটজনের সান্নিধ্য থেকে শিশুদের এভাবে বঞ্চিত করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ মানবতা বিরোধী এক জঘন্য অপরাধ। এই অপকর্মে অভিযুক্ত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে যুদ্ধাপরাধী বলেই অভিযুক্ত করেছিল ICC।

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে পুতিনকে স্বাগত জানানোর আগে প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা ICC -র সদস্যপদ প্রত্যাহার করার অঙ্গীকার করলেও আপাতত সেই অঙ্গীকার প্রত্যাহার করছেন এবং এক বিবৃতিতে স্বীকার করেছে সদস্যপদ প্রত্যাহারের অঙ্গীকারের ঘোষণা সঠিক কাজ ছিল না, মস্কো অবশ্য যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, রাশিয়া ICC -র সদস্য নয় বলে ICC -র এমন অভিযোগ করার কোনও এক্তিয়ার নেই।

চির বিদায় হ্যারি বেলাফন্টে

বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শেষদিক থেকে একাদিক্রমে প্রায় সাত দশক জুড়ে মার্কিন মুলুক সহ লাতিন আমেরিকা বা ক্যারিবিয়ন দ্বীপপুঞ্জের মানুষের হৃদয় উদ্বেলিত করা ক্যালিপসো সঙ্গীতের কিংবদন্তী শিল্পী হ্যারি বেলাফন্টে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন গত ২৫ এপ্রিল। 'জামাইকান ফেয়ারওয়েল'-এর বিখ্যাত শিল্পী অবশেষে জীবনকে ফেয়ারওয়েল জানালেন।

জন্মসূত্রে নাম ছিল হ্যারল্ড জর্জ বেলাফন্টে জুনিয়র। জন্মেছিলেন ১ মার্চ ১৯২৭। অশ্বেতকায় অভিবাসী মানুষদের বসবাস স্থান ন্যু-ইয়র্কের হার্লেম জেলায় তাঁর জন্ম। অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে ভাসমান পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জামাইকা থেকে এসেছিলেন তাঁর মা-বাবা।

বর্ণবিদ্বেষ-এর অভিশাপ বহন করেছেন কিশোর বেলাফন্টে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন কালো চামড়ার মানুষদের জীবনযন্ত্রণা। সম্ভবত এ কারণেই তাঁর প্রথাগত শিক্ষালাভের সুযোগ বেশ সংকুচিত হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত প্রতিভাকে কোনভাবেই আবদ্ধ করা যায় না। তিনি অল্প বয়সেই ক্যারিবিয় দ্বীপপুঞ্জের মাটির সুরে ও মূর্ছনায় সঙ্গীত জগতে অবতীর্ণ হন। জাতি বা বর্ণগত সমস্ত বাধার প্রাচীর তিনি অনায়াস দক্ষতায় অতিক্রম করে মানুষের মনের গহীনে স্থান করে নিয়েছিলেন। লোকমুখে ঘুরতো তাঁর সব অনবদ্য উপস্থাপনা। হ্যারি বেলাফন্টের আগে লুই আর্মস্ট্রং বা এলা ফিটজারেল্ড এর মতো সুউন্নত মাপের শিল্পীরাও বিশেষ অবদান সৃষ্টি করে মানুষের মন জয় করে নিয়েছিলেন। কিন্তু হ্যারি বেলাফন্টের মতো সুউচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হননি। তাঁর সময়কালে শ্বেত ও অশ্বেতকায় কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে তিনি স্থায়ী আসনে বৃত হয়েছিলেন।

শুধুমাত্র সঙ্গীত জগতেই নয়, তিনি হলিউড চলচ্চিত্র শিল্পেও বিশেষ স্থান দখল করেছিলেন। তাঁর অবিস্মরণীয় গানগুলির মধ্যে 'ব্যানানা সংগস' বা 'জামাইকান ফেয়ারওয়েল' প্রভৃতি এখনও শ্রোতাদের মনে শিহরণ জাগায়। ১৯৫৬ সালে তাঁর 'ক্যালিপসো' শীর্ষক গানের সংকলনের গীতিগুলি দীর্ঘ ৩১ সপ্তাহব্যাপী জনপ্রিয়তার শীর্ষে থেকেছে।

তবে হ্যারি ফেলাফন্টে শুধুমাত্র সঙ্গীতের জন্যই বিখ্যাত ছিলেন না। তিনি ছিলেন মার্কিন মুলুকে বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী ও নাগরিক অধিকার রক্ষা এবং সম্প্রসারণের এক অক্লান্ত যোদ্ধা। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র-এর ছায়াসঙ্গী। তাঁর আমৃত্যু সহযোগী কমরেড। এক অগ্রচারী আপসহীন ও অক্লান্ত যোদ্ধা হ্যারি বেলাফন্টে কখনও থেমে থাকেন নি। সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন নি। রাষ্ট্রের রক্তচক্ষুকে অবলীলায় উপেক্ষা বা মোকাবিলা করেছেন। অতি পরিণত বয়সেও তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর মতো অতি দক্ষিণপন্থী রাষ্ট্রপতির তীব্র বিরোধিতা করেছেন। চোখে চোখ রেখে প্রতিস্পর্ধী উচ্চারণ করেছেন।

হ্যারি বেলাফন্টে কিউবার বিপ্লবী নেতা ও রাষ্ট্রপতি কম. ফিদেল কাস্ত্রোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিউবার মানুষদের প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত করেছেন দৃঢ়ভাবে। এমনকি, ভেনেজুয়েলার 'একুশ শতকের সমাজতন্ত্রে'র উদ্গাতা হুগো চ্যাভেজের সঙ্গেও খোলাখুলি মেলামেশা করেছেন। তাঁদের আন্দোলনে সহমর্মিতা জানিয়েছেন। নিপীড়িত মনুষ্যত্বের প্রতি ছিল বেলাফন্টের অকৃত্রিম আকুতি এবং দায়বদ্ধতা।

দীর্ঘ ৯৬ বছর বয়সে হ্যারি বেলাফন্টে চিরনিদ্রায় চলে গেলেও তাঁর অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে এবং হবে। গণবার্তা পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁর অমলিন স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনেস্কির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি জেলেনেস্কির সাথে ফোনে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেনের সংঘর্ষে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছেন। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম চিনের পক্ষ থেকে আসা এমন প্রস্তাব অবশ্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। কিয়েভ অবশ্য ইতিপূর্বে বহু বার চিনের কাছে এমন প্রস্তাব বা আবেদন করেছিল। চিনের সরকারি সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা গিয়েছে, চিন ইউক্রেনে বিশেষ প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি এবং অন্যান্য সমস্যাগুলির সমাধান সূত্র বের করার চেষ্টা করবে।

চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং বলেছেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে এবং দায়িত্বশীল বড় দেশ হিসাবে বর্তমান সংঘর্ষে চিন নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকতে পারে না। চিন এই সমস্যার আগুনে ঘি ঢালবে না বা এই সমস্যা থেকে কোনও ফয়দা তোলারও চেষ্টা করবে না। চিনের পক্ষ থেকে ইউক্রেনে এবং অন্যান্য দেশে এক শান্তি বাহিনী পাঠানো হবে। চিনের পক্ষ থেকে ইউক্রেন যুদ্ধে মধ্যস্থতার প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে সংকট সমাধানের এক ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বলেই মনে হয়।

ঋণের ফাঁস থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে শ্রীলঙ্কা

অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা সব মিলিয়ে প্রায় ১৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমসিংঘে এই ঘোষণার সাথে সাথে আই এম এফ-এর ৩ বিলিয়ন ডলারের এক প্রকল্পের জন্য বিরোধী দলগুলির সমর্থনও চেয়েছেন। প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রম সিংঘে আরও বলেছেন, শ্রীলঙ্কা ঋণের বোঝা পুনর্গঠনের জন্য ভারত, ঋণ প্রদানকারীদের সংগঠন প্যারিস ক্লাবের সাথে এবং চিনের সঙ্গে আলাদাভাবে আলোচনা করবে। অবশ্য অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ঋণ পুনর্গঠনের (Debt restructuring) এর ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বিক্রমসিংহে।

জীবন বাঁচান, জল বাঁচান

সম্প্রতি ভারতের নীতি আয়োগ প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা গেল, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের ২১টি বড় শহরে ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ শূন্যে এসে দাঁড়াবে। এই তালিকার মধ্যে আছে চেন্নাই, ব্যাঙ্গালুরু, গুরুগ্রাম, দিল্লী। বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাইও সম্ভবত এই তালিকায় যুক্ত হতে চলেছে। রাজস্থানে জলের ঘাটতি সুবিদিত ঘটনা। মহারাষ্ট্রের মতো তথাকথিত উন্নত রাজ্যে এমন অনেক অঞ্চল রয়েছে যেখানে ১৫-২০ কিলোমিটার দূর থেকে ট্রেনে করে জল আনতে হয়, জীবন বাঁচানোর জন্য। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের আরও বহু শহরেই জলের অভাব তীব্র হয়ে উঠতে পারে। নীতি আয়োগের আবেদন, 'জলের অযথা অপচয় বন্ধ করতে হতে।' যথাসম্ভব পুকুর বা অন্যান্য জলাশয়ের জল ব্যবহার করার আবেদন করা হয়েছে। ভূগর্ভস্থ জল একেবার উঠে এলে তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, ঘাটতি বাড়তেই থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সহ সমগ্র পশ্চিমবাংলায় জলাশয় এবং পুকুরের মোট আয়তন সম্ভবত সারা বিশ্বের মধ্যেও এক বিশেষ সুবিধাজনক জায়গায় থাকলেও বিগত ৩০-৪০ বছরে যত্রতত্র গভীর বা অগভীর নলকূপ খনন করে অবিবেচকের মত কখনও সেচের প্রয়োজনে, কখনও পানীয় জলের তাৎক্ষণিক চাহিদা পূরণের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ কমিয়ে আনা হয়েছে। পশ্চিম বাংলার সর্বত্র জলাশয় এবং পুকুরগুলি যথাযথ সংস্কার ও জলসংরক্ষণ করে আগামী দিনে জলসংকট সমাধানের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

গভীর বা অগভীর নলকূপ খনন অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। কলকাতা এবং অন্যান্য শহরে জলাভূমি বুজিয়ে প্রোমোটারদের অন্যায় আচরণে লাগাম পরাতেই হবে। এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজ্য প্রশাসনের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। এই কাজটা সঠিক ভাবে করতে পারলে, গণ আন্দোলন এবং জনসংযোগের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত "নিষেধাজ্ঞা"র অস্ত্র ভোঁতা হয়ে পড়ছে কী?

ইউক্রেনে যুদ্ধ চলছে, এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরোপিত রাশিয়া এবং চিনের বিরুদ্ধে আরোপিত নিষেধাজ্ঞায় আখেরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানীর অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বাইডেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়া বা চিনকে 'টাইট' দিতে যদি অবিবেচকের মতো কাজ করে থাকে, পশ্চিমী দেশগুলিতে অর্থনীতিতে ধ্বস নামতে পারে। একাধিক মার্কিন এবং সুইস ব্যাঙ্কে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, নিষেধাজ্ঞার খাঁড়া নেমে আসার পর, রাশিয়া এবং চিন, দুই দেশই রপ্তানি বাণিজ্যে ১০০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মুনাফা অর্জন করেছে। একদিকে যখন জার্মানীতে বিপুল পরিমাণ বাণিজ্যিক ঘাটতি হয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ঘাটতির পরিমাণ ১০০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি, রাশিয়ার রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ২০২২ সালে ৬৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, ২০২১ সাল থেকে ২০২২ সালের মধ্যে রাশিয়ার রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ২০০ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৩৩২ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, চিনের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ২০২২ সালে রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৭৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে. ২০২১-২২ সালে চিনে বাণিজ্যের পরিমাণ ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, জার্মানীর অবস্থা খুবই করুণ, জার্মানীর ২০২২ সালে গত ২২ বছরের মধ্যে বাণিজ্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৫০ শতাংশ কমেছে, ২০০০ সালে জার্মানী রপ্তানি বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ১৭৫ বিলিয়ন ইউরো, ২০২২ সালে এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ নেমে এসেছে ৭৯ বিলিয়ন ইউরোতে। পাশাপাশি উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০২২ সালে বাণিজ্যে মোট ঘাটতির পরিমাণ ১১৯২ বিলিয়ন ডলার। "নিষেধাজ্ঞা" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যে রেকর্ড পরিমাণ ঘাটতির জন্য দায়ী কী? এমন উল্টো ফল বেশ মজার ব্যাপার বলে মানতেই হবে।

ফ্রান্স : শ্রম-আন্দোলনের সাতকাহন

তৃণাঞ্জন চক্রবর্তী

বিপ্লব ও শ্রেণি-সংগ্রাম ফ্রান্সের ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে। ১৭৮৯-এর ফরাসি বিপ্লবের কথা তো বিশ্ববিশ্রুত। উনিশ শতকেও ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লব, ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে বিপ্লবের ঢেউ-একের পর এক আছড়ে পড়েছে। বিংশ একবিংশ শতকেও উদাহরণের অভাব হবে না। মে ১৯৬৮-র ছাত্র-বিদ্রোহের রঙিন স্মৃতি তো আজও অম্লান, একদম হালফিলের হলুদ জ্যাকেট আন্দোলনও একবারে ফেলনা না।

একলা তাঁতি নিজের হাতে তাঁত বুনে সুতো যোগাতো যে সেই দালাল তার বোনা কাপড় বেচে দিত বাজারে। এবার দালাল দেখলেন নিজের নিজের ঘর থেকে তুলে এনে একটা বড়ো বাড়িতে এক পেল্লায় তাঁতযন্ত্রের সামনে অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন তাঁতিকে পাশাপাশি বসিয়ে দিলে তার খরচ অনেক কমে, মুনাফা অনেক বাড়ে। ব্যাস, শুরু হয়ে গেল কাপড়কলের যুগ। শুধু তো পণ্য নয়, কারখানা হয়ে উঠল শ্রমিক বানানোরও কল।

উনিশ শতকের কারখানা যেন একেকটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরি ইস্পাতকল, সুতোকল, পাটকল—ছুটির বাঁশি বাজলেই আগ্নেয়গিরির ভেতর থেকে যেমন গলিত তপ্ত লাভা নিঃসৃত হয়, তেমনভাবে দলে দলে বেরিয়ে আসছেন শ্রমে তেতেপুড়ে শ্রমিককুল। দৃশ্যটি তার প্রাকৃতিক প্রতিরূপের মতোই একাধারে মহৎ ও ভয়ংকর।

আঠারো-উনিশ শতকের শ্রমিক কথা বলতেন কি? ভাবনা চিন্তা করতেন কি? হুকুম তামিল করা ছাড়া আর কিছু করতেন কি তাঁরা? উনিশ শতকে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হয়ে অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মূল অন্তরায় ছিল কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক শোষণ। কারখানায় শ্রমিক এত নিষ্পেষিত যে, দৈনিক ১৫-১৬ ঘণ্টা হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর তাঁর আর বিশ্রামের দাবিতে, মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে লড়বার মতো সময় ও শক্তি অবশিষ্ট থাকত না।

শ্রমিক কল্যাণে তাই এই যুগে খ্রিস্টান মিশনারিদের একটা বড়ো ভূমিকা ছিল। Confederation francaise des travailleurs chretiens (CFTC) তেমন একটা ইউনিয়ন যার প্রতিষ্ঠা ১৯১৯-এ।

শ্রমিক ইতিহাসে আমরা শুনেছি কারখানার যন্ত্র ভেঙে দেওয়ার কথা। আমরা জেনেছি, সচেতনতার অভাবে নাকি যন্ত্রকে শোষক মনে করে, এ শোষিতের ভ্রান্ত এক আক্রোশ। কথাটা হয়তো পুরোপুরি ঠিক নয়। শ্রমিকর যন্ত্র বিগড়ে দিতেন একটানা কাজের মধ্যে ছেদ তৈরি করে খানিক অবসর উপভোগ করার জন্য। সেদিনকার শ্রমিকরা শুধু নন, আজকের আধুনিক শ্রমিকও নিরবচ্ছিন্ন কাজের ফাঁকে কফিতে একটু চুমুক দেবার বা ক্লান্ত কোমড় ও পিঠটাকে একটু ছাড়িয়ে নেবার, একটু ফুরসত পাবার আশে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা বিকল করে দেন।

ফরাসি বিপ্লবের পরের বছর এক সরকারি ফরমান মোতাবেক সংগঠিত ইউনিয়ন করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু পরের বছরই আইন করে তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হল। মার্ক্স এই আইনকে শ্রমিক-শ্রেণির বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের অভ্যুত্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

উনিশ শতকের গোড়ায় ফ্রান্সে জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ কৃষি-শ্রমিক। যদিও কৃষি-শ্রমিক বা ক্ষেত-মজুর শব্দবন্ধ ফরাসি অভিধানে তখনও স্থান পায়নি। কলকারখানার শ্রমিক তুলনায় সংখ্যায় খুবই অপ্রতুল। কিন্তু বিপজ্জনক হিসেবে তারা চিহ্নিত ও তাদের ঘিরে প্রশাসনের যেন একটু বাড়তি সতর্কতা।

ফরাসি বিপ্লব যে সকল নাগরিকের সমতার নীতিকে মান্যতা দিল, তাকে অবলম্বন করেই শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে শ্রমিক ক্রমশ সচেতন হয়ে ওঠে। ১৮৪০-এ হাইনরিখ হাইনে এক বর্ণনায় বলছেন, ফ্রান্সের শ্রমিকদের মধ্যে অতি প্রখর এই মর্যাদাবোধ ও অধিকার সচেতনতা। তিনি কারখানায় যন্ত্রপাতির পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখেছেন বিবিধ রাজনৈতিক পুস্তিকা, রবেস্পিয়েরের বক্তৃতা, বিপ্লবী ইস্তেহার ও প্রচার পত্র।

এই সময় থেকে শ্রমিকরা ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে শুরু করছে। ইউনিয়ন ঠিক নয়, কারণ সংগঠনগুলির কোনো প্রাতিষ্ঠানিক মান্যতা নেই, তবে তাকে ইউনিয়নের ভ্রূণ তো অবশ্যই বলা চলে। কিন্তু জন্ম নিয়েছে, যেমন আগে বললাম, 'সর্বাহারা' শ্রমিকশ্রেণি। এবং তার সবচেয়ে প্রিয় অস্ত্র হয়ে উঠেছে ব্যারিকেড।

উনিশ শতকের ফ্রান্সে তিনটি বড়ো বড়ো শ্রেণি-সংঘাত হয়েছিল। প্রথমটি ১৮৩১-এ। ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লব সদ্য সমাপ্ত। কিন্তু ওই যা হয়, পূর্ববর্তী রাজ-জমানার বিরুদ্ধে গায়ে গতরে লড়লেন শ্রমিক মধ্যবিত্তরা, মসনদে গদিয়ান আরেক রাজা। কিন্তু এই বিপ্লবের সাফল্যে বলীয়ান হয়ে লিয়ঁর রেশম-শ্রমিকরা মজুরির দাবিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করে।

১৮৪৮-এ দ্বিতীয় অভ্যুত্থান ও তার ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এই বিপ্লবের পূর্ববর্তী সময়ে সংস্কৃতি ও রাজনীতি এই দুটো ক্ষেত্র প্রায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছিল। দুই জগতের এত নিবিড় নৈকট্য খুব বিরল সাহিত্যের ইতিহাসে। প্যারিস হয়ে উঠেছিল ইউরোপের, একাধারে বিপ্লবের ও কৃষ্টির কেন্দ্র। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সূচনায় যে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল, তার মুখপাত্র ছিলেন স্বয়ং কবি লামার্তিন, বেশির ভাগ মন্ত্রী সাহিত্য, বিজ্ঞান ও আইন জগতের লোক। প্রত্যেকেই সুবক্তা এবং ভাষার কারিগর। সব মিলিয়ে ১৮৪৮ -এর বিপ্লবের যেমন এক অবশ্যম্ভাবী রাজনৈতিক চরিত্র আছে, তার সাংস্কৃতিক দিকটিও বেশ জবরদস্ত। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারির বিপ্লব ছিল তার সমস্ত স্বপ্ন, সবখানি ইউটোপিয়া নিয়ে আপাদমস্তক সাংস্কৃতিক মেজাজের। খেটে খাওয়া শ্রমিক ও সাধারণ মধ্যবিত্ত ভাবতে শুরু করেছিলেন তাঁদের দিন এবার ফিরবে, সাধ-আকাঙ্ক্ষা বোধহয় বাস্তব রূপ পাবে শিগগিরই। কিন্তু জেনারেল কাভাইনাকের (Cavaignace) নেতৃত্বে জুনে শুরু হল সেই ভয়ঙ্কর নরমেধ যজ্ঞ। সে রক্তপাত পৃথিবীর ইতিহাস খুব কম দেখেছে, কেবলমাত্র আউজউইচ বা হিরোশিমার সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে হয়তো। যে বিপ্লব সম্পর্কে তরুণ মার্ক্স বলেছিলেন, "লামার্তিনের আতসবাজি হয়ে গেল কাভাইনাকের আগুন ঝরা গোলা" (Lamartine's fireworks have turned into the incendiary shells of Cavaignac)। রাজনৈতিক ঝড়ের সামনে সাহিত্যের গালভরা গল্প খড়কুটোর মত উড়ে গেল। দেশটা নিপীড়ক ও নিপীড়িত —দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। সামরিক বাহিনীর পেছনে মুখ লুকালেন লিবেরাল বুর্জোয়ারা। যাঁরা এতদিন প্রজাতন্ত্রের স্বপ্ন বিক্রি করছিলেন, সেই রোমান্টিক মসিহারা সাধারণ মানুষের চোখে হাস্যাস্পদ হয়ে উঠলেন। "অনেক হয়েছে সুরবাহার"! ১৮৪৮-এর মে মাসে প্রৌঢ় লামার্তিন সুললিত ভাষণ দিচ্ছেন বিদ্রোহী জনগণের সামনে। ভীড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল, "মশাই থামুন এবার, অনেক হয়েছে সুরবাহার" (Assez de lyre)। যেন শুধু লামার্তিনের উদ্দেশ্যে নয়, প্রথম রোমান্টিকদের গোটা প্রজন্মের উদ্দেশ্যে যেন সময় জুড়ে দিল এক অব্যর্থ ভবিষ্যৎবাণী। অনেক হয়েছে গদগদ ভাষণ আর বাগাড়ম্বর, ওসব আর চলবে না।

জুন বিপ্লবের পর গোটা দেশ জুড়ে জরুরি অবস্থা জারি হল। প্রজাতান্ত্রিক তথাকথিত মুক্তিকামী এলিট শ্রেণি গুটিয়ে গেলেন নিজের মধ্যে। লামার্তিনকে গ্রাস করল বার্ধক্য, ভূতপূর্ব মন্ত্রী ল্যদ্রু-রোল্যাঁ ডুবে গেলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাতায়, মার্ক দ্যুফ্রেসের লুথারকে উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, "জনগণ হল গাধার পিঠে চড়া মাতাল চাষি। সোজা হয়ে বসে থাকতে পারে না। এক পাশে হেলে পড়ে যায়। ঠিক করে তাকে বসাও, দেখবে অন্য পাশে হেলে পড়েছে"। আপাদমস্তক এক নৈরাশ্য আর নিরাশাবাদ কায়েম হল প্যারিসের এলিট বিদ্যৎসমাজে।

এই বিরাট ধাক্কার পরে শ্রমিক আন্দোলন থমকে যায় প্রায় দুই দশক, তার পরে নতুন করে ফেটে পড়ে ১৮৭১-এর পারি-কমিউনে।

অবশেষে ১৮৮৪-র এক আইন মোতাবেক শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের অধিকার অর্জন করে। ফ্রান্সের সর্ববৃহৎ ইউনিয়ন 'La Confederation generale du travail' (CGT)-র জন্ম ১৮৯৫-তে। যে নেতার হাতে এই ইউনিয়নের জঙ্গি আন্দোলনের হাতেখড়ি ও এত শ্রমিকপ্রিয়তা, তাঁর নাম ভিক্তর গ্রিফ্যুয়েল।

এরপর ১৯৩৬-এ বামপন্থী ফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় এলেন, শ্রমিকদের অন্য সাপ্তাহিক শ্রমের সময় কমল, অবসরের সময় বাড়ল। বাৎসরিক ছুটির ব্যবস্থা ও বার্ধক্যে পেনশন চালু হল।

তবে অন্য এক হিসেবে সে ছিল ফ্রান্সের মতো উন্নত দেশের বড়ো সুখের দিন। উনিশ শতক। ফ্রান্সের রেলইঞ্জিন সিটি বাজিয়ে ছুটে চলত দূর-দুরান্তের ভুবন কাঁপিয়ে। সে ছিল এক অন্য ভুবনায়ন, ঔপনিবেশিক। আধুনিকতার রাজধানী প্যারিস। মেলায় ফরাসি প্রযুক্তির প্রদর্শনী দেখতে ভিড় জমাতেন দেশ-বিদেশের মানুষ। ১৮৬০-এ ইংল্যান্ডের হাত ধরে ফ্রান্সে এল মুক্ত-দুয়ার অর্থনীতি। ফ্লবের তাঁর 'আহাম্মকের অভিধান'-এ লিখলেন, "আমাদের সমস্ত খারাপ জিনিসের কারণ" সেই বাঁধা গত ফরাসি সমাজে আজও অব্যাহত। এরপর ১৮৬৯, ফ্রান্সের রানির সবুজ সংকেতে ইজিপ্টের পোর্ট-সাইদ থেকে বাণিজ্যিক নৌবহর সুয়েজ ক্যানেল হয়ে পাড়ি জমালো এশিয়ার বৃহৎ বাজারের উদ্দেশে। প্রথম এই ভুবনায়নের বৈশিষ্ট্য ছিল কাঁচামালের বিনিময়ে উপনিবেশগুলিতে ইউরোপে প্রস্তুত পণ্যের যোগান।

১৯৬২-তে প্রযুক্তি নির্ভর উচ্চফলনশীল কৃষির উদ্বৃত্ত ক্রেতার হাতে পৌঁছে দিতে সীমান্তের বেড়া ভেঙে দেওয়া হল। সারা ইউরোপ জুড়ে তৈরি হল কৃষিপণ্যের খোলা বাজার। ১৯৭৩-এর উর্ধ্বমুখী পেট্রো-মূল্যের ধাক্কায় ধরাশায়ী ফ্রান্স আঁকড়ে ধরল এক নব্য ভুবনায়ন। মুক্ত বাজারনীতি তার ভরকেন্দ্র। কৃষিবিজ্ঞানী রনে দ্যুমোঁর কলমে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে পরিবেশ-চিন্তা স্বীকৃত হল। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই ভুবনায়নের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে, আর কাঁচামাল নয়, শুধু শিল্পপণ্যের বিনিময়।

১৯৮২ থেকে ফ্রান্সের তখতে সমাজবাদী ফ্রঁসোয়া মিতেরঁ। তাঁর আমলেই প্রথম আধুনিকীকরণ হল ফ্রান্সের অর্থনীতির, সুসংগঠিত হল বিশ্বায়িত আর্থিক বাজার। ১৯৮৯-এ বার্লিন-প্রাচীরের পতন। পূর্ব ইউরোপ, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, চিলির মতো মার্ক্সবাদের সাবেক দুর্গে মিশেল ফুকোর মরণোত্তর গ্রন্থ 'যৌনতার ইতিহাস' সিংহাসনচ্যুত করল 'দাস ক্যাপিটাল'কে। কোনো সর্বজনীন লক্ষ্যস্থলের বালাই নেই, তার আছে শুধু মারাত্মক এক স্থিতিস্থাপকতা। অনেকটা হাতিয়ারের মতো-ফুকোর এই 'টুলবক্স'। মহা-আখ্যানের 'গ্লাসনস্ত' বলা যায় একে? বা খুদে-আখ্যানের বিশ্বায়ন? তৃতীয় এই বিশ্বায়নে আর পণ্যের আমদানি বা যোগান নয়, বিশ্বের কোণে কোণে সতী-দেহের মতো খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ল উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সারা বিশ্ব থেকে যন্ত্রাংশ এনে, জড়ো করে বানানো হল পুতুল, ফোন বা এরোপ্লেন। এই উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে সমন্বিত করতে প্রয়োজন হল আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার।

প্রায় দুশো বছর ধরে যে চিত্রনাট্য তিলে তিলে লেখা হচ্ছিল তা যেন অন্তিম ক্লাইম্যাক্সে এসে পৌঁছল এবার। ১৯৯২-তে হল্যান্ডের মাস্ট্রিচে যে চুক্তিপত্রে সিলমোহর পড়ল তার থেকে জন্ম নিল 'ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন'। কোনো বিপুল ভূখণ্ডের রূপে নয়, তা বাস্তবায়িত হল ক্ষুদ্র মুদ্রার রূপ ধরে। ২০০২-এ ছড়িয়ে পড়ল ক্রেতার পকেটে পকেটে। বিশ্বায়ন কি আসলে ক্ষুদ্রায়ণ?

এই বিশ্বায়ন বা ইউরোপিয়নে জনসাধারণ কতখানি উপকৃত হলেন? ফ্রান্সের নিজস্ব শিল্পোদ্যোগ তো বটেই, যেসব মার্কিন বা বহুজাতিক সংস্থা ফ্রান্সে জমিয়ে বসেছিল অচিরেই পাট গুটিয়ে পালালো সস্তা শ্রমের দেশে। অর্থনীতিতে রক্তক্ষরণ শুরু হল, যার পোশাকি নাম বি-শিল্পায়ন। এদিকে শ্রম-নিবিড় শিল্পগুলি উন্নত প্রযুক্তির দৌলতে পুঁজি-নিবিড় হয়ে উঠল। বিশ্বায়ন নিয়ে প্রাথমিক উচ্ছ্বাস পর্যবসিত হল গভীর অবসাদে।

খণ্ডিত উৎপাদন-প্রক্রিয়ার তালে তাল মেলালো খণ্ডিত শ্রম, খণ্ডিত জীবিকা, জীবন। সকাল থেকে সন্ধ্যা, যৌবন থেকে জীবন-সায়াহ্ন— নিরবচ্ছিন্ন শ্রমজীবনের দিন শেষ। বিগত আস্ত বেতনের যুগ।

অতএব—'ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা!' 'অ্যাঁদিনিয়ে ভু!'। একটি রচনা। রচয়িতা, লেখক, কূটনীতিজ্ঞ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রাক্তন সৈনিক স্তেফান এসেল (১৯১৭-২০১৩)। পাতা তিরিশেকের এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি ফ্রান্সে ২০১০-এর বেস্ট সেলার। সেই থেকে ফ্রান্সে একটা শব্দবন্ধ চালু হয়েছে—'মুভমঁ দেজ্যাঁদিনিয়ে', 'ক্ষিপ্ত মানুষের আন্দোলন'। যে আন্দোলনের পেছনে কোনো ইউনিয়ন বা রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত নেই। যে আন্দোলনের মাথায় চড়ে নেই কোনো নেতা বা পলিট ব্যুরো। যে আন্দোলন একান্তই স্বতঃস্ফূর্ত, এলাকা ভিত্তিক ছোট ছোট অ্যাকশন কমিটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কিন্তু সহসা মানুষ এভাবে ক্ষেপে উঠছেন কেন? একটু পেছনের দিকে তাকানো যাক। ২০০০ থেকে ২০০৭ অব্দি ফ্রান্সে ৬৩ শতাংশ চাকরির সুযোগ হ্রাস পেয়েছে। উৎপাদনের ব্যয় কমাতে কল-কারখানাগুলি পাততাড়ি

—এরপর ৪ পাতায়

ফ্রান্স : শ্রম-আন্দোলনের সাতকাহন

৩-এর পাতার পর—

গুটিয়ে চলে গেছে ফ্রান্সের মাটি ছেড়ে। কল-কারখানার অভাবে শ্রমিক নামক শ্রেণিটিই যেন আজ ফ্রান্সে এক অবলুপ্ত-প্রায় প্রজাতি। কোনো সরকারের পক্ষেই সম্ভব হয়নি বি-শিল্পায়নের এই রক্তক্ষরণ থামানো।

ফ্রান্সের কৃষিক্ষেত্রে গড়ে প্রতি দুদিন অন্তর একজন কৃষক আত্মহত্যা করছেন। শ্রম, বীজ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সমেত কৃষি বা পশুপালনের খরচ এতটাই বেলাগাম যে কৃষকের পেট ভরা দুরস্থান, ঋণভারে জর্জরিত অবস্থা তার। এদিকে আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার কৃষকদের সাথে পাল্লা দিতে কৃষিপণ্যের মূল্যের ওপর মারতে হচ্ছে কোপ।

শ্রমিক কৃষকের মত মধ্যবিত্ত জীবনের ওপরও নেমে এসেছে খাঁড়ার ঘা। বিশেষত ছোট শহর বা শহরতলির বাসিন্দা যাঁরা। মজার কথা হল ফ্রান্সে মধ্যবিত্তের সংজ্ঞায় এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। একসময় মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নির্ণয় করা হত এক দিকে ধনিক শ্রেণি ও অপর দিকে শ্রমিক শ্রেণির মধ্যবর্তী এক স্তর হিসেবে। অর্থাৎ নির্ণয়ের মানদণ্ডটি ছিল অর্থনৈতিক। এখন শহরতলির মধ্যবিত্ত ধরা হয় তাঁদের, যাঁরা বসবাস করেন অভিবাসী অধ্যুষিত পল্লীর চৌহদ্দির বাইরে, যাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ছোটখাটো বাড়ির মালিক আর যাঁদের গায়ের রঙ প্রধানত সাদা। অর্থাৎ মাণদণ্ডটি হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকটাই জাতিসত্তা- ভিত্তিক। এইসব ছোট শহর বা শহরতলিতে বিগত দিনে গ্রাম থেকে এসে মানুষ ভীড় জমিয়েছিলেন চাকরির আশায়। কারণ উনবিংশ, বিংশ শতকের শিল্পবিপ্লবের যুগে, বিশেষত মহাযুদ্ধ-পরবর্তী শিল্প উৎপাদনের তিন স্বর্ণ-দশক জুড়ে এগুলি হয়ে উঠেছিল স্বচ্ছল শিল্প-উৎপাদনকেন্দ্র। ১৯৯০ দশকের থেকে উপেক্ষিত হতে হতে তারাই ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়ল। ফ্রান্সের মাটিতে ফাটল ধরল, এক দেশের মধ্যে যেন জন্ম লি আলাদা দুটি দেশ, জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ নিয়ে বিশ্বায়নের প্রসাদ-পুষ্ট মহানগর-ভিত্তিক কেন্দ্রীয় ফ্রান্স এবং ৬০ শতাংশ নিয়ে গ্রাম-শহরতলির প্রান্তিক ফ্রান্স।

সংখ্যাগুরু প্রান্তিক ফ্রান্স যেমন নিজেকে গুটিয়ে ঢুকে পড়ে জাতিসত্তার খোলসের মধ্যে, তেমনি সংখ্যালঘু ও বিশ্বায়িত এই কেন্দ্রীয় ফ্রান্স নিজেকে আরো প্রসারিত করে, রাষ্ট্রপতি মাকরঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে উর্দ্ধে তুলে ধরতে চায় সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদকে। নিন্দুকেরা অবশ্য বলেন মাকরঁ এই বহুত্ববাদী তত্ত্বের আড়ালে আসলে মান্যতা দিতে চান ফ্রান্সের ওপর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের খবরদারিকে। আর তাঁর কাছে মাথা নুইয়ে ফ্রান্সের রাজনৈতিক নেতারা পৌর পরিষেবার সংকোচ ঘটান, জিনিসপত্র, পরিষেবা বা সম্পত্তির ওপর অন্যায্য সব কর চাপিয়ে দেন, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অবলুপ্তির পরিকল্পনা করেন, শ্রমিক-কর্মচারীর অধিকার খর্ব করেন।

অন্যদিকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে ক্ষয়িষ্ণু বিশ্বায়ন উপেক্ষিত ফরাসি আশা-ভরসার স্থল হয়ে উঠছেন যেন 'ফ্রোঁ নাসিওনাল' বা জাতীয় ফ্রন্টের মত দক্ষিণপন্থী উগ্র জাতীয়তাবাদী দল ও তাঁদের নেত্রী মারিন ল্য পেন। যেহেতু, শ্রমিক-কৃষক- মধ্যবিত্তের বৃহদংশ নিয়ে নিম্নগামী লিফটে সওয়ারি প্রান্তিক ফ্রান্সের গায়ের রঙ প্রধানত সাদা, হলুদ জ্যাকেট আন্দোলনের মধ্যে কিছু কিছু বর্ণবিদ্বেষী ঝোঁক লক্ষ্য করলে আমরা অবাক হব না। কারণ এই শ্বেতাঙ্গ ফ্রান্সকে অনেকাংশে বোঝানো গেছে, যত নষ্টের গোড়া ওই কালো ও বাদামি অভিবাসীরা।

প্রান্তিক এই ফ্রান্স তাই ক্ষণে ক্ষণে ইদানীং ফুঁসে ওঠে। মিশরের 'আরব বসন্ত', স্পেনের 'পদেমস' থেকে মার্কিন দেশের অকুপাই আন্দোলন বা ফ্রান্সের 'লা ন্যুই দ্যবু' হয়ে আজকের 'হলুদ জ্যাকেট'-'ক্ষিপ্ত মানুষের আন্দোলন' দ্বিতীয় সহস্রাব্দের নানা পর্যায়ে নানা দেশে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। প্রথাগত রাজনৈতিক পরিসরে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর যখনই অশ্রুত অবহেলিত হচ্ছে তখনই মানুষ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বয়ান পরিত্যাগ করে আইন অমান্যের পথ, সরাসরি অংশগ্রহণের পথ বেছে নিচ্ছেন। এই আন্দোলনের ব্যাকরণের উৎস খুঁজতে আমাদের কি পৌঁছে যেতে হবে প্যারিসের ১৯৬৮-র ছাত্রবিদ্রোহে? সেখানেই তো প্রথম সূচিত হয়েছিল সাবেকি রাজনীতি বা প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনকে পরিত্যাগ করে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের নতুন এই রাজনৈতিক বয়ান। আবার এই আন্দোলনকে অনেকে বুঝতে চাইছেন ১৯৫০-এর দশকের পুজাদিস্ত আন্দোলনের আলোকে। শপিং মল, সুপারমার্কেটের মালিক বড় পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে ছোট দোকানদার, কারিগর শ্রেণির বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে।

এবার আসি এমান্যুয়েল মাকরঁর কথায়। ফরাসি প্রেসিডেন্ট হিসেবে জার্মানির চ্যান্সেলর আঙ্গেলা মের্কেলের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই কবুল করেছিলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাকরঁ। জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি করতে হলে চাই ফ্রান্সের সমাজের গভীরে বেশ কিছু পরিবর্তন। ইউরো-অঞ্চলের ভবিষ্যত নির্ভর করছে এই অচলায়তনকে ভাঙার সাফল্যের ওপর। উনচল্লিশ বছরের সদ্য-নির্বাচিত রাষ্ট্রনায়ক এমন কিছু করে দেখালেন যা তাঁর আগে আর কেউ পারেননি। শ্রমিকের কাজের অধিকারে হস্তক্ষেপ, শ্রম-আইনের আমূল সংশোধন। যে সংস্কার ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে ইতালি স্পেন জার্মানির মতো পশ্চিম ইউরোপের অন্য কয়েকটি দেশে। ফ্রান্সে তা গত সেপ্টেম্বর থেকেই অর্ডিন্যান্স মারফত বলবৎ হয়ে গিয়েছিল। ২৮ নভেম্বর পাশ হয়ে গেল আইনসভায়, ৪৬৩ বনাম ৭৪ ভোটে।

অনেকে বলেছেন, নীরব রক্তহীন প্রতিবিপ্লব। 'কাজ বেশি, মজুরি কম'—শিল্পবিপ্লবের পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি শ্রম-বাজারের মূল সুরটি বেঁধে দিয়েছিলেন শিল্পমালিকরা। ইউরোপে প্রথম এর ব্যতিক্রম ১৯৩৬-এ, ফ্রান্সে। সমাজতন্ত্রী, সাম্যবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তি একজোট হয়ে সেখানে সরকার গড়ল। শ্রমিকের মজুরি ও অবসরের বিষয়টি প্রথম সরকারি স্তরে গুরুত্ব পেল। যুদ্ধপরবর্তী কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রনীতিতে এই সমাজতন্ত্রী আদর্শই প্রতিষ্ঠা পেল। খ্রিস্টীয় পরম্পরাগত শ্রমের বন্দনা ছেড়ে সমাজ-সংস্কৃতি ক্রমে অবসরকেন্দ্রিক হয়ে উঠল। শুরু হল 'শ্রম-সংস্কৃতি'র অবমূল্যায়ন।

বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ফ্রান্সে অর্থনীতি শুধু উৎপাদনমুখী ছিল না, তার মধ্যে ছিল এক সামাজিক দায়বদ্ধতাও—শ্রমিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার অঙ্গীকার। সত্তরের দশকে পেট্রোল ও পেট্রোলজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কায় এই দায়বদ্ধতার ভাঁড়ারে টান পড়ল। কলকারখানা বন্ধ, বেকারত্ব আকাশ- ছোঁয়া— চাকরির সঙ্গে কর্মীর আত্মমর্যাদা, আত্মপরিচয়ের অনুষঙ্গ যত ক্ষীণ হতে থাকল, জোরদার হতে লাগল নেতিবাচক নিরাপত্তার অনুষঙ্গটি। চাকরিকে যেন তেন প্রকারেণ টিকিয়ে রাখতে না পারলে নির্বাসিত হতে হবে সমাজের অন্তেবাসীর দলে—এই ভয়ের সেই শুরু। বহিষ্করণের এই ভয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লাগামছাড়া হল কাজের চাপ, তজ্জনিত রোগ ও দুর্ভোগ।

এত দিন অবধি তবুও এক রক্ষাকবচ ছিল ফ্রান্সের শ্রমিকের হাতে। শ্রম-আইন সম্পর্কিত সরকারি এক সংকলন। এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে উনবিংশ শতক থেকে শ্রমিকের অর্জিত অধিকারের খতিয়ান। গ্রন্থটি বৃহদাকৃতি, কয়েক হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী আইনের ধারা উপধারায় এক জটিল সন্নিবেশ। মালিক-পক্ষ, বিশেষত ছোট ও মাঝারি উদ্যোগপতিদের মতে তার সরলীকরণ খুবই জরুরি। এই আইন-গ্রন্থের জটিলতা নাকি এমনই যে, শিল্প-সংস্থাগুলি শ্রমিক নিয়োগ করতে পারছে না ছাঁটাই করতে গিয়ে আইনি ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে। নয়া সরলীকৃত আইনে কী থাকছে?

অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের বিষয়টি জাতীয় স্তরে একটি আইন মোতাবেক এ যাবৎ স্থির হত। সেটি এখন স্থির হয় শিল্পক্ষেত্রের স্তরে। অর্থাৎ গাড়ি, ইস্পাত, শক্তি ইত্যাদি শিল্পক্ষেত্রের নিজের নিজের চাহিদা অনুসারে সেই সেই ক্ষেত্রে অস্থায়ী কর্মীর মেয়াদ ও চুক্তি-নবীকরণের বিষয়টি স্থিরীকৃত হয়।

স্থায়ী নিয়োগের চুক্তিতে পরিবর্তন এসেছিল আগেই; শিল্পের কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রকল্পভিত্তিক স্থায়ী কর্মী নিয়োগ, আসলে যা ছদ্মবেশী অস্থায়ী নিয়োগ। কেন না প্রকল্প শেষ হয়ে গেলেই চুক্তির শেষ। এ দিকে কর্মীর চাকরিটিও গেল অথচ চুক্তি-অন্তে অস্থায়ী কর্মীর আর্থিক ক্ষতিপূরণটুকুও পাওয়া হল না। নয়া আইনে এই নিয়োগের ক্ষেত্রটিকে আরও সম্প্রসারিত করা হল।

কী পরিস্থিতিতে কর্মী কাজ করবে—কর্মস্থলের নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যের বিষয়টি তত্ত্বাবধানের জন্য কর্মস্থলভিত্তিক কমিটি গঠন করা হয়। বর্তমান আইনে এই কমিটি তুলে দেওয়ার কথা উঠছে। কঠোর পরিস্থিতিতে কর্মরত শ্রমিকের যে মানসিক ও শারীরিক ক্ষয়, শ্রমিক সংগঠনগুলোর শতাব্দীপ্রাচীন আন্দোলনের ফলে তার কিছুটা প্রতিকার হয়, স্বীকৃত হয় শ্রমিকের নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যের অধিকার। বর্তমান আইনের ফলে তার ওপর আঘাত নেমে এসেছে। বস্তুত এই আইন মোতাবেক, শ্রম যে মূলগত ভাবে একটি কঠোর ও কষ্টকর প্রক্রিয়া, সেই ধারণাটিই লোপ পেতে চলেছে। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই কিন্তু যুদ্ধপরবর্তী ফ্রান্সে গড়ে উঠেছিল কর্মী ও শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষাতন্ত্র।

রোগভোগের ছুটি নিলে সরকারি কর্মীদের এমনিতেই এক দিনের বেতন কাটার রেওয়াজ ছিল। বেসরকারি সংস্থায় এ ক্ষেত্রে এক দিনের ছুটি নিলে দিনের বেতন খেসারত দিতে হয়। নয়া আইনে বলছে, এই নিয়ম বরাবর হওয়া উচিত। অর্থাৎ সরকারি বাবুদেরও এক দিনের ছুটিতে তিন দিনের খেসারত দিতে হবে। মালিকের চোখে এই অসুস্থতা, আসলে কাজ না-করার ছুতো। অর্থাৎ আলিস্যি ও বদভ্যাসের প্রতিষেধক হবে এই খেসারত-ব্যবস্থা।

সর্বশেষ প্রসঙ্গটি শ্রম-আদালত বিষয়ক। বেআইনি ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে শ্রমিক যেখানে তাঁর অভিযোগ দায়ের করতে পারেন ও উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন। মালিকপক্ষের সুবিধার্থে এই ক্ষতিপূরণে একটা উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, এর ফলে এত দিন যে ছাঁটাই বেআইনি ছিল, তা আইনি বৈধতা পেল।

বলা হল, শ্রমিক মালিক সরকার, তিন পক্ষের যৌথ চিন্তনের ফসল এই আইন। উদ্দেশ্য : বেকারদের ক্ষতিপূরণের 'নিষ্ফল' নীতি ছেড়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ। তথাকথিত সামাজিক সুরক্ষা বলয়-এ যাবৎ সুরক্ষিত রাখতে পারেনি কর্মপ্রার্থীর স্বার্থ, বরং ঘুরপথে বেকারত্ব বাড়িয়েছে। কর্মসংস্থান বাড়াতে হলে বিনিয়োগের খরা কাটাতে হবে। উদ্যোগপতিকে আরও অক্সিজেন দিতে হবে। মালিক-শ্রমিক চুক্তিতে আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে বেরিয়ে এসে নমনীয়তা আনতে হবে। অর্থনৈতিক সংকটকে চাহিদার দিক থেকে নয়, বরং জোগানের দিক থেকে মোকাবিলা করতে হবে। অর্থাৎ শুধু শ্রমিকের বেতন ও সুরক্ষা বৃদ্ধির পথে ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে (এ দাওয়াই ইতিপূর্বেই ডাহা ফেল) তার সুরাহা হবে না,শ্রম তথা উৎপাদনের খরচ কমাতে হবে। আজকের অর্থনীতিতে চাকরি আজ আছে কাল নেই। কিন্তু টালমাটাল এই চাকরির বাজারে মানুষকে বেঁচে থাকার সম্বল জোগানো যায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। সরকারি অর্থের বহুলাংশ তাই ব্যয় হচ্ছে কর্মপ্রার্থীর প্রশিক্ষণের খাতে।

'পুঁজির দালাল' নামে অভিহিত এমানুয়েল মাকরঁ যে কোনও নতুন কথা বললেন তা তো নয়। ডান-বাম নির্বিশেষে ফরাসি রাষ্ট্রনায়কদের পুরনো বক্তৃতা-বিবৃতিগুলি ঘাঁটলেই এই সত্যের আভাস পাওয়া যাবে। ২০১৬'য় সমাজতান্ত্রিক ফ্রঁসোয়া ওলাঁদ বা এমানুয়েল ভাল্জ, ২০১২ সালে প্রথাগত দক্ষিণপন্থী নিকোলা সারকোজি, এমনকী ১৯৮৮'তে জাক শিরাকের গলায়ও শোনা গিয়েছিল ঠিক এক লব্জ। নিন্দুকের মতে, এই শ্রম-নীতির আসল প্রবক্তা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। ফরাসি দেশটার সার্বভৌমত্বই নাকি প্রশ্নচিহ্নের মুখে। জাতীয় রাষ্ট্রনায়করা বকলমে একেকজন 'ইউরোপিয়ান সঙ্ঘের মুৎসুদ্দি'।

রাষ্ট্রশক্তি জনগণের দাবিদাওয়া সম্পর্কে কতটা নির্মম ও উদাসীন তার সাম্প্রতিকতম নিদর্শন অবসরের বয়সবৃদ্ধি। ১৯০৬-এ শ্রমিকরা প্রথম জঙ্গি আন্দোলনে সামিল হন দশ ঘণ্টা কাজ, ইউনিয়নের সম্প্রসারণ ও বার্ধক্য পেনশনের দাবিতে। বহু টালবাহানার পর, ১৯১০-এ অবসরের বয়স প্রস্তাবিত হয় পঁয়ষট্টিতে। মালিক ও সরকারের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের ইউনিয়ন বেঁকে বসে। তাঁরা বলেন এটা একটা ধাপ্পাবাজি— কারণ অধিকাংশ শ্রমিকের পরমায়ু ষাটের চৌকাঠই পেরোতে পারে না। ১৯৮১-তে ফ্রাঁসোয়া মিতেরঁ-র নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিকেরা ক্ষমতায় আসেন। ১৯৮২তে অবসরের বয়স কমিয়ে আনা হয় ষাট বছরে।

অবসরের বয়স ও শ্রমিক-কর্মচারীর যে কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই কোনোদিন সহজ ছিল না। দক্ষিণপন্থীরা সমস্ত নখ-দাঁত বার করে চিরকাল তাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছেন।

প্রশ্ন হল, ফরাসি সমাজের গভীরে প্রোথিত 'শ্রমিক-প্রীতি'-র 'অচলায়তন' এ বার যে এত সহজে নড়ানো গেল, তার পেছনে নতুন সরকার ও রাষ্ট্রপতির হাতযশ, বিরোধী পক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনগুলির ভিতর বোঝাপড়ার অভাব, না কি রাজনৈতিক ভাবে অরক্ষিত জনসাধারণের অসহায়তা?

স্বৈরতন্ত্র সততই ষড়যন্ত্র নির্ভর

মনোজ ভট্টাচার্য

(এক)

২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচন বর্তমানে মোদি সরকারের কাছে বিশেষ দুশ্চিন্তার। দীর্ঘ এক দশককাল ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যার দেশে মোদি সরকারের গ্রহণযোগ্যতার পারদ নিম্নমুখী হওয়ায় সংঘ পরিবার এবং তাদের রাজনৈতিক শাখা বিজেপির সংশয় প্রতিদিনই গভীরতর হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য সাফল্যের তেমন কোনও নজির এই সরকার অদ্যাবধি সৃষ্টি করতে ব্যর্থ। সর্বজনগ্রাহ্য যে, নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি যে সব গগনস্পর্শী প্রতিশ্রুতি নির্ভর হয়ে ২০১৪ সালে দিল্লির তখ্‌ত দখল করেছিলেন তাঁর প্রশাসনিক কর্মধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হওয়ার ফলে দেশের বহুসংখ্যক মানুষের মধ্যে মোদির যোগ্যতা সম্পর্কে বিশেষ সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে।

২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে দেশের বৃহদংশ মানুষের কাছে পাকিস্তান বিরোধী উগ্র জাতীয়তাবাদী জিগীর বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। এমন সন্দেহ অমূলক নয় যে, ছদ্মজাতীয়তাবোধের মানদণ্ডকে বিশেষ বেগবান করতে জম্মু-কাশীরের সমগ্র জনসমাজকেই পাকিস্তান ঘেঁষা বলে প্রচার ছিলই। ওই রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত হবার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় বিশ্বাসে অন্ধ আনুগত্যের জনসমাজ শাসকদলের এমন অনৈতিক প্রচারে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। সবাই এমন অন্ধত্বগ্রাসে নিমজ্জিত ছিলেন বা আছেন তা অতিশয়োক্তি। দেশের জনসমষ্টির উল্লেখযোগ্য অংশ সংঘ পরিবারের উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হননি। তাঁদের সামনে এমন কিছু উদাহরণ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল, যা অন্ততপক্ষে তাঁদের নিশ্চুপ করে দিতে পারে। তাঁদের বিশেষ কোনও ঘটনার তীব্র অভিঘাতে ভীত বিহ্বল করে দিতে পারে। তাঁরা সরকারের কোনও সমালোচনা করার সামান্যতম চেষ্টা করলেও মোদি নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া বা সংবাদ মাধ্যম যাকে, ‘গোদি মিডিয়া’ বলে অভিহিত করা হয়, তারা সমস্বরে চিৎকার করে সমালোচকদের দেশ ও জাতি বিরোধী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ভোটে প্রভূত সুবিধা আদায় করে নেবে।

বিগত প্রায় একদশক কাল জুড়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সদর দপ্তর নাগপুরের প্রভাব, এমনকি নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের দৈনন্দিন কর্মকান্ডে পরিমিতি বোধহীনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংঘ পরিবারভুক্ত সবকটি শাখাই উচ্চকিত স্বরে দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রকে এক করে ফেলে। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি বা সংগঠন রাষ্ট্র পরিচালনার ত্রুটি সম্পর্কিত বিষয়ে মন্তব্য করলেই তাঁকে দেশদ্রোহী বলে দাগিয়ে দেওয়া চলতে থাকে। হিন্দু ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এইভাবে দেশ ও রাষ্ট্রকে এক করে ফেলা বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত, সন্দেহ নেই। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে এর এক বিশেষ আবেদন পরিকল্পনামাফিক নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সকলেই যে ঘোর প্রবঞ্চনামূলক কারসাজি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এমন বলা যায় না। আবার অনেকেই প্রভাবিত হয়েছেন, বিভ্রান্তির চোরাবালিতে নিমজ্জিত হয়েছেন, তাও সঠিক। এই বিভ্রান্ত ধর্মানুরাগীদের আরও বেশি বেশি অন্ধ আনুগত্যে গেঁথে ফেলার জন্য নানা অমানবিক ঘটনাবলীর প্রকাশ পর্যন্ত নির্মিত হয়ে চলেছে। অভিসন্ধি অবিরাম। স্বৈরশাসনের অভিজ্ঞান।

ভারত সরকার বিলক্ষণ অবহিত যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রটি বিভিন্নভাবে সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে মদত দিয়ে চলে। অভ্যন্তরীণ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অমোঘ দুর্বলতা এই রাষ্ট্রটিকে দীর্ঘকাল যাবৎ সন্ত্রাসের সূতিকাগারে পরিণত করেছে। বিগত শতাব্দীর আশি-নব্বই-এর দশক থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় ভারতের এই প্রতিবেশী রাষ্ট্রটির আর্থ-রাজনীতি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মধ্যে আবর্তিত। প্রথমাবস্থায় তা ছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগান রণনীতির বিরুদ্ধে নিহিত। তালিবানি সামরিক কার্যকলাপে সহায়তা করার লক্ষ্যে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির আজ্ঞাবহ। আফগানিস্তানে ডা. নাজিবুল্লাহের ‘রেজিম চেঞ্জ’ এর পর কর্মচ্যুত বা কর্মহীন হয়ে পড়া সন্ত্রাসী বাহিনী ভারতের দিকে নজর দেয়। বিশেষ করে কাশ্মীর উপত্যকা তাদের লক্ষ্য।

ভারত সরকারের বিদেশমন্ত্রক এবং প্রতিরক্ষা বাহিনী এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট অবহিত। আরও লক্ষ্যণীয়, গত ১৯৯৮ থেকে ভারতে আর এস এস-এর নির্দেশনায় সরকারি প্রশাসন পরিচালিত হবার সময়কাল থেকেই ‘ আড়্ পাড় কী লড়াই’ অর্থাৎ, সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনাগুলি বেগবান হয়ে পড়ে যথেষ্ট। অটলবিহারী বাজপেয়ী তখন ভারতের এন ডি এ সরকারের প্রধান। ১৯১১ সালে কারগিল সংঘর্ষে বহু সংখ্যক ভারতীয় সেনার প্রাণের বিনিময়ে কিছুকালের জন্য সীমান্ত সংঘর্ষগুলি স্তিমিত হয়ে পড়ে। বন্ধ হয় নি।

বিজেপি নেতা অটলবিহারীর লাহোর বাস ‘ডিপ্লোমেসি’ বা কূটনৈতিক প্রয়াস প্রচুর বিজ্ঞাপিত হলেও যথাযথ ফললাভ করেনি। কিন্তু কারগিল সংঘর্ষের পরবর্তীকালে কাশ্মীর সীমান্ত সেভাবে চঞ্চল হয়েও ওঠেনি। বিজেপি বা আর এস এস-এর উস্‌কানিমূলক কর্মপ্রকল্পগুলি অবসিত হয়নি। কারণ, এই শক্তিগুলির কাছে ভারতের সংখ্যালঘু মানুষদের বিশেষ করে, মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত কোটি কোটি মানুষকে অ-ভারতীয় বা প্রকারান্তরে ভারত-বিরোধী হিসেবে প্রতিপন্ন করতে না পারলে ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির পালে হাওয়া তোলা সম্ভব নয়। সে কারণেই ভারতের নানাপ্রান্তে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ, সংঘর্ষ প্রভৃতির সঙ্গে পাকিস্তান বিরোধী জিগীর বিশেষ ফলদায়ক। আবার পাকিস্তানের শাসকদের কাছেও সে দেশের উগ্র ইসলামপন্থীদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ভারত বিরোধী জিগীর একটি সহজ রণনীতি। ভূ-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট সমন্বিত কাশ্মীর উপত্যকা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি বিশেষত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও লোভনীয়।

২০০২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ন্যু-ইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংস। প্রচার করা হয়, একদা মার্কিন সামরিক শক্তির প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও নিবিড় প্রশিক্ষণে সৌদি যুদ্ধবাজ ওসামা-বিন-লাদেন নেতৃত্বাধীন আল কায়েদাই এত সহস্র মানুষের প্রাণনাশের জন্য দায়ী। অতএব সেই একদা বহুযত্নে গড়ে তোলা ওসামা বাহিনীর মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর দিগন্তবিস্তৃত সামরিক অভিযান। বহু লক্ষ নিরীহ আফগানবাসীর প্রাণনাশ। মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত এই দেশটি। সীমান্ত সংলগ্ন পাকিস্তানের, বিশেষ করে খাইবার-পাখতুন খোয়া অঞ্চলে অনেক সশস্ত্র সন্ত্রাসীর আত্মগোপন। মার্কিন ও সহযোগী শক্তিগুলির এই যুদ্ধ আয়োজনে পাকিস্তান রণকৌশলগত সহযোগী।

(দুই)

২০০৪ সালে ভারতে বিজেপির বহু প্রচারিত ‘শাইনিং ইন্ডিয়া’র ফানুস চুপসে যায়। শত চেষ্টা করেও বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে অসফল। ইউ পি এ সরকার গঠিত হল। তথাকথিত ‘আড় পাড় কি লড়াই’ এর বিরতি। সীমান্তের এপার থেকে উগ্র সাম্প্রদায়িক উস্‌কানি বন্ধ হবার ফলে পাকিস্তানের যুদ্ধবাজ শক্তি বস্তুত যুদ্ধ উন্মাদনা থেকে সাময়িককালের জন্য হলেও সরে দাঁড়িয়েছিল। ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর মুম্বাই শহরে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের বীভৎস বা নারকীয় ধ্বংস কাণ্ডে বিশ্ব জুড়ে পাকিস্তান বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়। ভারতের সামরিক বাহিনী এবং মুম্বাই পুলিশের তৎপর সাহসিকতায় বহু প্রাণ বেঁচে যায়।

সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে সামরিক উত্তেজনা থাকলেও তা সামরিক সংঘর্ষে পরিণত হয় নি। ২০১৪ সালে ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী অপশক্তি রাজ্যপাট পরিচালনার দায়িত্বে আসার পর থেকেই আবার সক্রিয় হয়ে উঠলো সীমান্ত সংঘর্ষ। নরেন্দ্র মোদির নাটকীয় বা চমক সৃষ্টি করা কূটনীতি নেহাৎই ছেলেখেলায় পরিণত। আর এস এস এবং বিজেপি অবশ্য এমন সংঘর্ষের বাতাবরণ সম্পূর্ণ পরিবর্তন বা অবসান করতে আদৌ উৎসাহী ছিল না। ভারতে অতি জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের অগ্রগতির জন্য পাকিস্তানের মতো একটি ইস্‌লামিক রাষ্ট্রের অবস্থিতি বিশেষ ফলদায়ক। নরেন্দ্র মোদির মতো এক চরম চণ্ডনীতির উপাসক উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শাসক কখনোই ভারত-পাক সীমান্তে পূর্ণ শান্তি চাইতে পারেন না। তাঁর রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করার লক্ষ্যেই তিনি এবং তাঁর দল পাকিস্তানের সঙ্গে বৈরিতা টিকিয়ে রাখতে উৎসাহী ছিল এবং এখনও আছে।

ছদ্ম অতিজাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তি ২০১৪ সালে ক্ষমতাদখলের পর থেকে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কোনও সদর্থক অগ্রগতি সম্ভব করতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়। বরঞ্চ মোদি সরকার উদ্ভাবিত ও অনুসৃত নীতিগুলি ভারতের জনজীবনকে বেশি বেশি করে উদ্বাস্তু করে তোলে। এরই মধ্যে ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচন-এর ডঙ্কা বেজে ওঠে। শত মিথ্যা প্রচারেও মোদির দল পুনর্বার জয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছিল না। নানাভাবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরির অপচেষ্টাগুলিও অন্যপক্ষের নিস্পৃহতার জন্যই হয়তো তেমন কোনও উত্তেজক পরিস্থিতি নির্মাণে ব্যর্থ। হাতের কাছে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীদের আগ্রাসনের সুযোগ করে দেবার অস্ত্র মজুতই ছিল। ভারতের মুখ্য নিরাপত্তা উপদেষ্টা কট্টর আর এস এস ক্যাডার অজিত দোভাল এবং মোদি সম্ভবত অভিসন্ধিমূলকভাবেই কাশ্মীর উপত্যকায় কোনও অনাসৃষ্টি আয়োজন করতে ফন্দি আঁটেন। দেশবাসীকে পাকিস্তান বিরোধী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় জারিত করে অন্যান্য সমস্ত ব্যর্থতাগুলিই আড়াল করা সম্ভব। মোদি সেই পথেই হাঁটলেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন জাতীয় সড়ক দিয়ে সি আর পি এফ জওয়ানদের ৭৮টি বাসে করে পরিক্রমা শুরু হল। অতি সংবেদনশীল সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে এত বড় একটি মিছিল করে সামরিক বা আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া কি পূর্ব পরিকল্পিত ছিল?

বিতর্কিত প্রসঙ্গ বাদদিলেও ভারতের বহুসংখ্যক খুর্ফিয়া এজেন্সি বা গুপ্তচর সংস্থা যথা RAW, NIA প্রভৃতি যথেষ্ট শক্তিশালী। এছাড়াও সামরিক বাহিনীর নিজস্ব গুপ্তচর বাহিনী তো আছেই। এই সব বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেন মুখত প্রধানমন্ত্রী (নরেন্দ্র মোদি), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (অমিত শাহ), প্রতিরক্ষামন্ত্রী (রাজনাথ সিং) এবং মোদির বিশেষ আস্থাভাজন অজিত দোভাল। এদের কেন কখনোই মনে হল না যে, উপদ্রুত পাক সীমান্তবর্তী অঞ্চল দিয়ে এত সংখ্যক সি আর পি এফ জওয়ানদের সড়কপথে জম্মু থেকে শ্রীনগর নিয়ে যাবার কোনও যুক্তি ছিল না! নাকি এই সব পুঙ্গবরা সব বুঝেও এত বিশাল সংখ্যক নিম্নবিত্ত কৃষক পরিবারের সন্তানদের সামরিক পোশাক পরিয়ে অবধারিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে এতটুকু দ্বিধান্বিত ছিলেন না!

সি আর পি এফ-এর শীর্ষ কর্তারা বারবার দিল্লিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উচ্চতম মহলে অনুরোধ করেও জওয়ানদের আকাশপথে শ্রীনগর পৌঁছানোর অনুমতি পাননি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে নাকি অনেক অর্থব্যয় হবে বলে সড়কপথেই সি আর পি এফ জওয়ানদের যাত্রা নির্দিষ্ট করে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ভোর সাড়ে তিনটায় এই বিশাল বাহিনীর যাত্রা শুরু। আর দুপুর প্রায় সাড়ে তিনটার সময় পুলওয়ামার লেথেপুরা ও অবন্তীপুরার কাছাকাছি অঞ্চলে প্রাণঘাতী সন্ত্রাসী বিস্ফোরণ।

(তিন)

এক বিশাল কনভয়ে জওয়ানদের অতি সংবেদনশীল পাকিস্তান সংলগ্ন অঞ্চলের জাতীয় সড়ক দিয়ে যেতে দেওয়া হল। ইদানীংকালে জম্মু ও কাশ্মীরের তৎকালীন রাজ্যপাল মোদি ঘনিষ্ঠ সত্যপাল মালিক দাবি করেছেন যে তিনি এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুললে এবং সি আর পি এফ বাহিনীর গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য বিমানযাত্রার ব্যবস্থা করতে বললে তাঁকে চুপ করে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন। আশঙ্কামতো ওই ৭৮টি গাড়ির কনভয়ে প্রচুর বিস্ফোরক সহ একটি গাড়ি ধাক্কা মারে। কমপক্ষে চল্লিশজন জওয়ানের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। অনেকে আহত। রক্তস্নাত পুলওয়ামা। প্রতিশোধ নেবার আস্ফালন ভারত সরকারের।

তারপর যেন চিত্রনাট্য তৈরিই ছিল। ২৬ ফেব্রুয়ারি বালাকোটে তথাকথিত ‘সার্জিকাল স্ট্রাইক’। ১২টি মিরাজ ২০০০ যুদ্ধবিমান কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে পাকিস্তান ভূখণ্ডে সশস্ত্র হানা। পুলওয়ামার বদলা। ভারতের দাবি পাকিস্তানের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া অনেকগুলি সেনা শিবির নির্মূল করা হয়েছে। পাকিস্তানের দাবি, তেমন কিছুই হয় নি। দু’চারটে গাছ ধ্বংস হয়েছে। ধূলো উড়েছে। সত্যি মিথ্যে প্রমাণে সাধারণ মানুষের কোনও অধিকারই নেই। সম্ভবও নয়। তারপর আবার টান টান উত্তেজনায় ভরপুর ভারতীয় বায়ুসেনার এক দক্ষ অফিসার ‘অভিনন্দন’-এর বীরত্বপূর্ণ অভিযান এবং নিশ্চিন্ত প্রত্যাবর্তন! টেলিভিশনের পর্দায় সমগ্র দেশকে দেখানো হল সেইসব রোমহর্ষক ঘটনাবলি। সাধারণ মানুষ, অনেকেই বলতে শুরু করেছিলেন, ‘মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়’। মোদিই পারবেন দেশকে পাকিস্তানের হামলা থেকে সসম্মানে বাঁচাতে। অতএব পদ্মফুল জিন্দাবাদ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। নির্বাচনের অল্পকিছুকাল আগেই এমন উঁচু পর্দায় বাঁধা চিত্রনাট্য সফল।

সেই সময় ১৭ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ভাস্কর পত্রিকায় পুলওয়ামা হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলা হয়। সত্যপাল মালিক যা বলছেন তার সঙ্গে সেই সংবাদভাষ্য মিলে যাচ্ছে। ভারত সরকার কিন্তু দৈনিক ভাস্কর পত্রিকার সাংবাদিক হেমন্ত অত্রীকে চুপ করে থাকতে বলেনি।

এখন লক্ষ করা যাচ্ছে যে, সমরবিদ্যা বিশারদ ও ভারতের সেনাবাহিনীর প্রাক্তন প্রধান জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরীও মনে করেন যে, পুলওয়ামা হত্যাকান্ডের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্য নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল তাঁদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। সেই সময়কালে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর দায়িত্বও কম নয়। বারবার অনুরোধ করলেও কোন বিবেচনায় অতি সংবেদনশীল অঞ্চল সড়কপথে অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত হল। নির্বাচনে জয়লাভের পথ সুগম করতেই কি মোদি ও তাঁর সহযোগীরা এত মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন? ভারতের সচেতন মানুষরা নিশ্চিতই গণতান্ত্রিক বোধে উজ্জীবিত হয়ে সেই প্রশ্নের জবাব চাইবেন।

মে দিবস কিছু কথা

শেষাদ্রি ভূষণ সাহা

মে দিবসের দিনটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে কর্মদিবসকে সংক্ষিপ্ত করার সংগ্রামের ইতিহাস। শ্রমজীবী জনগণের চেতনায় সমৃদ্ধ এক গুরুত্বপূর্ণ মুখ্য রাজনৈতিক দাবি আদায়ের ইতিহাস যা সংগ্রামী শ্রমিক অংশের রক্তঝড়ার এক সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে ১৮৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম আট ঘণ্টা শ্রম দিবসের লক্ষ্যে ছুটি উদযাপনের ধারণাটির বিকাশ ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কলকারখানা স্থাপনের শুরু থেকেই এই আন্দোলন ক্রমশ বিকশিত হয় এবং সংহত হতে দেখা যায়। অস্ট্রেলীয় শ্রমিকদের সংগ্রাম আমেরিকার শ্রমিকদের প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তীতে দেশে দেশে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে মে দিবসের সংগ্রাম সমাজ পরিবর্তনে অনুপ্রেরণা দেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম পর্যায়ে শ্রমজীবী জনগণের মজুরি বৃদ্ধির দাবি ছিল ধর্মঘটের প্রধান কারণ, এর সাথে কর্মদিবসকে সংক্ষিপ্ত করা এবং তা সংগঠিত করার অধিকারকে সর্বদা সামনের সারিতে রাখা হয়েছিল। কারখানার মালিক এবং গভর্নমেন্টের অমানবিক শোষণ তীব্রতর হওয়ায় এবং দীর্ঘ কর্মদিবসে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ তীব্র হয়, ফলে দীর্ঘ কর্মদিবস হ্রাসের দাবি আরও স্পষ্ট ও জোরালো হয়।

উনিশ শতকের শুরুর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'সূর্যেদয় থেকে সূর্যাস্ত' পর্যন্ত ছিল তখনকার প্রচলিত কর্মদিবস। দৈনিক শ্রম দিবস ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টা এমনকি দিনে ১৮ ঘণ্টাও অস্বাভাবিক ছিল না। পরবর্তীতে দিনে ১৯ থেকে ২০ ঘণ্টা অমানবিক দীর্ঘ কর্মদিবসেরও ইতিহাসও জানা যায়। অনেক শ্রমিক এই দীর্ঘ কর্মদিবসের ফলে কাজ করতে করতে মূর্ছা যেতেন।

আলেকজান্ডার ট্রাকটেনবার্গ মে দিবসের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ— ২০ এবং ৩০-এর দশক কর্মদিবস সংক্ষিপ্ত করার আন্দোলন ধর্মঘটে পরিপূর্ণ ছিল। অনেক শিল্প কেন্দ্রে কর্মদিবস দিনে ১০ ঘণ্টার করার জন্য নির্দিষ্ট দাবি রাখা হয়। ১৮২৭ সালে ইংল্যান্ডের শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত ''মেকানিক্স ইউনিয়ন ফিলাডেলফিয়া'' যা বিশ্বের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে বিবেচিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের পেনসেনভেলিয়া রাজ্যের ফিলাডেলফিয়ায় দিনে ১০ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবির ধর্মঘটের সাথে তারা যুক্ত হয়। ১৮৩৪ সালে নিউ ইয়র্ক শহরে রুটি উৎপাদনের সাথে যুক্ত শ্রমিকেরা ধর্মঘট করার সময়ে 'ওয়ারকিং মেন্স অ্যাডভোকেট' পত্রিকায় লেখা হল—''রুটির ব্যবসায় নিয়োজিত শ্রমিকরা বছরের পর বছর ধরে দুর্বিসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে, মিশরের দাসত্বের থেকেও তাদের অবস্থা করুণ। সমস্ত দিনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গড়ে ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা তাদের কাজ করতে হয়।'

ধীরে ধীরে সমগ্র আমেরিকাতে ১০ ঘণ্টার কাজের দাবি সংগ্রামের রূপ নিল। এই সংগ্রামের ফলে ১৮৩৭ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ভ্যান বুরেন সরকারী কাজে নিযুক্ত সমস্ত কর্মচারীদের ১০ ঘণ্টা কাজের ডিক্রি জারি করেন। সকলের জন্য ১০ ঘণ্টা কাজের সংগ্রাম পরবর্তী দশকগুলিতে অব্যাহত হইল। কিছু শিল্পে ১০ ঘণ্টা কর্মদিবস মেনে নেওয়া না হলেও পরবর্তীতে ৮ ঘণ্টা কর্মদিবসের জন্য আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকেরা যেখানেই শোষিত হচ্ছিল সেখানেই শ্রমিকেরা এই শোষণের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছিল। এর ফলে ৮ ঘণ্টার কাজের দাবি শুধু আমেরিকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, সুদূর অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের নির্মাণ শ্রমিকেরা ''৮ ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘণ্টা বিনোদন এবং ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম''-এর শ্লোগান দেন।

দাসত্বের বিকৃতি যতদিন না আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটা অংশকে মুক্ত করতে পেরেছিল, ততদিন উত্তর আমেরিকাতে শ্রমিকদের স্বাধীন আন্দোলনের অবস্থাকে তা পঙ্গু করেছিল। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়কালে ৮ ঘণ্টার কাজের দাবিই ছিল মুখ্য, ফলে সেই সময় আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর, নিউ ইংল্যান্ড থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের বিক্ষোভে পরিপূর্ণ হয়। ১৮ই আগস্ট ১৮৬৬ সালে বাল্টিমোরে তিনটি ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা জড়ো হয়ে 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন' স্থাপন করেন। শিল্প শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তারা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে :— বর্তমানে প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজনীয়তা হল—পুঁজিবাদী দাসত্ব থেকে এই দেশের শ্রমিক শ্রেণিকে মুক্ত করা, তার জন্য এমন একটি আইন পাস করা যার দ্বারা আমেরিকার সমস্ত রাজ্যে ৮ ঘণ্টার স্বাভাবিক কর্মদিবস হবে। যতদিন না এই গৌরবময় ফলাফল অর্জিত হচ্ছে, আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে সংকল্পবদ্ধ হচ্ছি। ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন-এর নেতা কম. সিলভিস লন্ডনে স্থিত 'প্রথম আন্তর্জাতিক' এর সাধারণ পরিষদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে ইউনিয়নকে প্রভাবিত করেন।

'ইন্টারন্যাশনার ওয়ার্কিং মেন্স এ্যাসোসিয়েশন'' ৮ ঘণ্টার কর্মদিবসকে ১৮৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেনিভা কংগ্রেসে প্রথম আন্তর্জাতিক এর সভায় ৮ ঘণ্টার কর্মদিবসের দাবিকে মান্যতা দিয়ে লেখা হল—

'যে প্রাথমিক ব্যবস্থা ছাড়া উন্নতি এবং মুক্তির জন্য আরও সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, তা হল কর্মদিবসের সীমাবদ্ধতা... কংগ্রেস প্রস্তাব করেছে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কর্মদিবসকে বৈধতা দিচ্ছে। পরবর্তীতে সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসেও একই প্রস্তাব নেওয়া হয়।

১৮৬৭ সালে প্রকাশিত মার্কস-এর বিখ্যাত বই 'ক্যাপিটাল'-এর পাতায় শ্রেণি চেতনার সংহতির চিত্র ফুটে উঠল। ৮ ঘণ্টা কাজের সীমাবদ্ধতা নিয়ে তিনি লিখলেন :—'যেহেতু এই সীমাবদ্ধতা উত্তর-আমেরিকার শ্রমিকদের সাধারণ দাবির প্রতিনিধিত্ব করে, কংগ্রেস এই দাবিকে সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকদের সাধারণ প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরিত করেছে''। ইংরেজ ফ্যাক্টরি পরিদর্শক আর জে স্যান্ডার্স-এর রিপোর্টকে কার্যত অনুমোদন দিয়ে 'ক্যাপিটাল'এর পাতায় মার্কস দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন—মাত্র দু সপ্তাহের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত শ্রমিক কংগ্রেসে নেওয়া সিদ্ধান্ত কিভাবে ৮ ঘণ্টার আন্দোলন আটলান্টিক মহাসাগরের উভয় পার্শ্বে উৎপাদনকে প্রভাবিত করে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন ক্রমশ দৃঢ়বদ্ধ হচ্ছিল। মার্কস মনে করতেন—প্রত্যেক জাতির একটা বিরাট অংশের অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণির স্বাস্থ্য এবং দৈহিক শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করতে দৈনিক কাজের সীমাবদ্ধতা থাকা জরুরি। শ্রমিকের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, সামাজিক আলাপ-আলোচনা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সুরক্ষিত করতে যা একান্ত প্রয়োজন। মার্কস -এর আশঙ্কা ছিল, যদি ৮ ঘণ্টা কাজের দিন হিসাবে স্থির না হয় তবে সমস্ত বৈধ নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ হয়ে পুঁজি হাতে তা চূর্ণ হবে।

১৮৭৫ সালে পেনসেলভ্যানিয়া শহরে খনি শ্রমিকদের সংগঠন ভেঙ্গে দেবার উদ্দেশ্যে ১০ জন শ্রমিককে ফাঁসি দেওয়া হয়। ১৮৭৭ সালে সরকার সৈন্য প্রেরণ করে রেলপথ এবং ইস্পাত শিল্পে ধর্মঘট দমন করে। হাজার হাজার শ্রমিকদের এই সংগ্রাম সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। এই সংগ্রাম থেকে শ্রমিকরা সমাজে তাদের শ্রেণি অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন হয়।

১৮৮১ সালে নভেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় আমেরিকার শ্রমিক সংগঠন ''আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার''। ১৮৮৪ সালের ৭ অক্টোবর তাদের চতুর্থ কনভেনশনে তারা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮৮৬ সালের ১ মে থেকে ৮ ঘণ্টার কর্মদিবসকে বৈধতা দিয়ে ঐ দিন সারা আমেরিকা জুড়ে ধর্মঘটের ডাক দেয়। প্রায় ৫ লক্ষ শ্রমিক ঐ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন।

শ্রমিকদের মেজাজ জানার সর্বোত্তম উপায় হল তাদের সংগ্রামের ব্যাপ্তি এবং তার গুরুত্ব অধ্যয়ন করা। আলেকজান্ডার ট্রাকটেনবার্গ ধর্মঘট আন্দোলন ছড়িয়ে পরার বর্ণনা দিলেন ঃ— বিগত বছরের তুলনায় ১৮৮৫ এবং ১৮৮৬ এর মধ্যবর্তী সময়ে ধর্মঘটের সংখ্যা শ্রমিক আন্দোলনকে উজ্জীবিত করল। ১৮৮৫ সালেই ধর্মঘট প্রশংসনীয় হারে বৃদ্ধি পায়। ১৮৮১-১৮৮৪ এই সময়কালে ধর্মঘট, লকআউটের সংখ্যা ছিল এক বছর গড়ে পাঁচ শতাধিকের কম এবং প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক তাতে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৮৫ সালে ধর্মঘট এবং লকআউট প্রায় সাত শত'র মতো বৃদ্ধি পেল আর শ্রমিকদের অংশগ্রহণের সংখ্যা বাড়ল আড়াই লক্ষতে। ১৮৮৬ সালে ধর্মঘটের সংখ্যা ১৮৮৫ এর থেকে দ্বিগুণেরও বেশি হল। একটা পরিসংখ্যান বলছে, সমস্ত রকমের অন্তর্ঘাত সত্ত্বেও ১৮৮৬ সালে ১১,৫৬২র মতো সংস্থা ধর্মঘটে ক্ষতিগ্রস্থ হল, পাঁচ লক্ষের অধিক শ্রমিক সরাসরি জড়িত হলেন এই ধর্মঘটে। পত্রপত্রিকা এই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়াতে দ্বিধা করল না। নিউ ইয়র্ক টাইমস এই ধর্মঘটকে অমার্কিন বলে অভিহিত করে লিখল ঃ— বিদেশিরাই এনেছে শ্রমিক অসন্তোষ। এই ধর্মঘটকে বানচাল করার জন্য মালিক এবং পুলিশের চলল সমান্তরাল প্রস্তুতি।

১ মে শিকাগো শহরই ছিল ধর্মঘটের সবচেয়ে আক্রমণাত্মক রূপ এবং প্রাণকেন্দ্র। পরবর্তীতে তা দ্রুত পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে পরে। নিউইয়র্ক, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, সিনসিনাটি, সেন্ট লুইস, পিটসবার্গ, ডেট্রয়েট এবং অন্যান্য অনেকগুলি শহর শ্রমিক শ্রেণির ওয়াক আউটের ভাল প্রদর্শন করল। ''সামাজিক যুদ্ধ'' এবং ''পুঁজির প্রতি ঘৃণা'' যা এই ধর্মঘটগুলির সময় প্রকাশিত হলেও তারা ৮ ঘণ্টার কাজের দিনটি সুরক্ষিত করতে না পারলেও, শ্রম দিবস প্রশংসনীয় ভাবে হ্রাস করতে সফল হয়েছিল। শ্রমিকদের এ লড়াই তাদের জীবনযাত্রা এবং কাজের অবস্থার উন্নতি শুধুমাত্র এই তাৎক্ষণিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না, ছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থারও বিলুপ্তি সাধন।

সংস্কারপন্থী বিপথগামী নেতারা শ্রমিক সংগঠনগুলিকে ভুল পথে পরিচালিত করেন। ধর্মঘটের প্রস্তুতির জন্য '৮ ঘণ্টা এ্যাসোসিয়েশন' স্থাপন করা হয়েছিল অনেক আগেই। বামপন্থী শ্রমিক ইউনিয়নগুলির সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন, '৮ ঘণ্টা এ্যাসোসিয়েসন'কে পূর্ণ সমর্থন দিল। যা একটি ছিল ঐক্যবদ্ধ সংগঠন, এবং ফেডারেশনের সাথে যুক্ত ইউনিয়নগুলি সহ যুক্তফ্রন্ট সংগঠন, নাইটস অফ লেবার, এবং সোশ্যালিস্ট লেবার পার্টি। পহেলা মে'র আগের রবিবার ১৮৮৬ সালে কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন একটি জমায়েতের আয়োজন করেন। সেখানে ২,৫০,০০০ শ্রমিক সামিল হন।

১ মে ১৮৮৬ সালে শিকাগো শহর অভূতপূর্ব এক দিনের সাক্ষী রইল। শ্রমিক ধর্মঘটের ডাকে সাড়া দিয়ে কারখানা ছেড়ে মিছিল করে দলে দলে শ্রমিকরা শিকাগো শহরে জমায়েত হতে লাগলেন। শ্রমিক সংহতির এমন মেলবন্ধন যা, আগে এই শ্রমিক আন্দোলন কখনোও প্রত্যক্ষ করেনি। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার শ্রমিকের সেই মিছিলে স্লোগান শ্রমিকের উদাত্ত কণ্ঠে গানে মুখরিত হল শিকাগোর আকাশ। ধর্মঘটের ব্যাপ্তি ও তার চরিত্র তাৎপর্যপূর্ণ এক রাজনৈতিক বার্তা দিল। পরবর্তী আন্দোলনের দিক নির্ধারণের দিন ছিল তরা মে।

একটা সঠিক বিপ্লবী শ্রেণি কর্তৃক শেষপর্যন্ত বিপ্লবের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত প্রতি-বিপ্লবের সম্ভাবনা থেকেই যায়। ফলে শিকাগো শহরে শিল্প মালিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের দাবির ধর্মঘটকে গুঁড়িয়ে দিতে একযোগে ষড়যন্ত্রর রচনা করল। ৩ মে ''ম্যাকর্মিক হারভেস্টিং ম্যাশিন কোম্পানি'' নামক কারখানায় ধর্মঘট রত শ্রমিকদের মিটিং এ সশস্ত্র পলিশ মারাত্মক আঘাত হানল। পুলিশের গুলিতে ছয় জন শ্রমিক প্রাণ হারান, আহত হন অনেকে। এর পরেরদিন ৪ঠা মে শিকাগো শহরে হে মার্কেট স্কোয়ার এ পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদে এক সভার আয়োজন হয়। সেদিনের সভায় পার্সনস যখন বক্তৃতা শেষ করলেন রাত্রি তখন দশটা, শান্তিপূর্ণ এই সমাবেশের পর্যবেক্ষক শিকাগো শহরের মেয়র কার্টার হ্যারিসন সহ অনেকে বিক্ষোভকারীরা ততক্ষণে সভা ছেড়ে চলে গেছেন। সভা প্রায় শেষের পথে। একদল পুলিশ সমবেত শ্রমিকের উপর চড়াও হয়, সে সময়ের ভিড়ের মধ্যে আচমকা এক বোমা পরে, মুহূর্তের মধ্যে এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। ৭ জন পুলিশ সহ মারা যায় ৪ জন শ্রমিক আহত হন প্রচুর। গ্রেফতার হন আগস্ট স্পাইস, স্যাম ফিল্ডেন, মাইকেল স্কোয়াব, আডলভ ফিশার, জর্জ এঙ্গেল, লুই লিংগ, অস্কার নীবে। অ্যালবার্ট পার্সনসকে প্রথমে পুলিশ খুঁজে পায়নি। বিচারের নামে চলল প্রহন। বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হলেও পুঁজিপাদী ব্যবস্থায় আগস্ট স্পাইস, অ্যাডলভ ফিসার, জর্জ এঙ্গেল, অ্যালবার্ট পার্সনসদের ফাঁসি দেওয়া হয়। ২২ বছরের যুবক লুই লিংগ আত্মহত্যা করলেন অথবা তাকে খুন করা হয় জেলের মধ্যে।

১৮৮৬ সালে হে মার্কেট স্কোয়ার ম্যাসাকারের ফলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা শ্রমিকদের এই আকারের বিক্ষোভের পুনরাবৃত্তি করতে বহু বছর ধরে বাধা দেয়। এরই মধ্যে ইউরোপে শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের সবচেয়ে শক্তিশালী অভিব্যক্তি ঘটে ১৮৮৯ সালে ১৪ই জুলাই ফরাসি বিপ্লবের ১০০ বছর পূর্তিতে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ''দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'' এর প্রথম কংগ্রেসে। কার্ল মার্কস তখন বেঁচে নেই। তিনি দেখে যেতে পারেননি শ্রমিকদের সচেতন অংশের অভ্যুত্থান। এঙ্গেলস এর উপস্থিতিতে এই অধিবেশনেই স্থির হয় ১৮৯০ সালের ১ মে থেকে প্রতি বছর এই দিনটি সারা বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক সংহতি সৌভ্রাতৃত্ব ও সংগ্রামের দিন হিসাবে পালন করা হবে। সেই দিন থেকে আজও পালিত হয়ে আসছে মে দিবস। **(ক্রমশঃ)**

আন্তর্জাতিক মে দিবস

অশোক ঘোষ

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে মে দিবসের ঐতিহাসিক সংগ্রাম আন্তর্জাতিকভাবেই আট ঘণ্টার কাজের আইনের প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। মে দিবস শুধু আট ঘণ্টার কাজের দাবিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকার আন্দোলনেও প্রেরণা জুগিয়েছে। কিন্তু গত তিন দশকে ধীরে ধীরে শ্রমের বাজারে গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। আট ঘণ্টার কাজের অধিকার, আইন সঙ্গত কাজের শর্তাবলী এবং দাবি আদায়ে দর কষাকষির অধিকার ইত্যাদি হারাচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি।

বিভিন্ন উন্নত বহুজাতিক সংস্থায় দেদার ছাঁটাই ও নিয়োগ বন্ধ হওয়ার মতো ঘটনা কোভিড সংক্রমণের আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ভারতেও বহু সংগঠিত আধুনিক প্রযুক্তির উন্নত শিল্পেও কোভিড পরবর্তী সময়ে বিপুল হারে নতুন নিয়োগ কমেছে। নতুন চালু হওয়া আধুনিক শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। তথ্য প্রযুক্তি শিল্পেও নতুন নিয়োগ হচ্ছে না। তার প্রভাব পড়েছে এই প্রজন্মের নতুন কর্মী, বিশেষ করে ১৮ থেকে ২৮ বছরের কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে। সংগঠিত ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সমূহের সদস্য সংখ্যা কমেছে। আট ঘণ্টার কাজের অধিকার পরিবর্তন করে সরকারের পক্ষ থেকে বারো ঘণ্টার কাজের বিধিব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কার্যত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সমূহকে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী নয়া উদারবাদী অর্থনীতি চালু হওয়ার পর থেকেই ক্রমাগত কাজের বাজারের চরিত্রগত পরিবর্তন হয়েছে আর এই পরিবর্তন শিল্প ক্ষেত্রে শ্রম সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে। আট ঘণ্টার কাজ শুধু নয়, নিয়মনীতি থেকে, নির্দিষ্ট সময়ে বেতন বৃদ্ধি সহ কাজের নিরাপত্তা পর্যন্ত আর থাকছে না।

কাজের বাজার নিয়ে আজ সারা বিশ্ব তোলপাড়। এদেশেই শুধু নয় আন্তর্জাতিক দুনিয়াতে কাজের জোগান, চাহিদা, কাজের চরিত্রগত পরিবর্তন ও মজুরি এক প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। ব্যাপক কর্মী ছাঁটাইয়ের কথা যেমন শোনা যাচ্ছে, আবার কিছু পরেই যোগ্য কর্মীর অভাবে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে শিল্প প্রতিষ্ঠান। এক কথায় কর্ম সংকোচন এবং কর্মপ্রসার যেন আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো আজকের কাজের জগতে এক স্বাভাবিক প্রবণতা। ফলে পরস্পর বিরোধী তথ্যের কানাগলিতে পড়ে পথ হারিয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারছেনা অর্থনীতিবিদ এবং পণ্ডিতেরা। তাহলে কি কাজ পাওয়া এবং না পাওয়ায় চিরাচরিত সমস্যা ফুরিয়ে গেল? অর্থাৎ ক্ষণিকের অপেক্ষাতেই মিলে যেতে পারে কাজ—আবার সে কাজ হারিয়ে যেতেও সময়ের সামান্য অপেক্ষা মাত্র। তারপর ফের অন্য কোনও কাজে কিছুটা স্বস্তি। মাঝে কিছুটা সময়ের ব্যবধান, অনিশ্চয়তা অপেক্ষা।

ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আই এল ও) তথ্য বলছে নিয়োগ বাড়ছে সেই সব ক্ষেত্রে যেসব ক্ষেত্রে কাজের চরিত্র অস্থায়ী। এর অর্থ কাজ করাতে গিয়ে নিয়োগ কর্তাদের তরফে সামাজিক সুরক্ষা, নানাবিধ সুযোগসুবিধা দেওয়া, তার আর কোনও প্রয়োজন থাকছে না। সহজ কথা, আইন উপেক্ষা করে কম মজুরি দিয়ে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। যার ফলে দেখা যাচ্ছে সামগ্রিক ভাবে গড় মজুরি কমে যাচ্ছে, লাফিয়ে লাফিয়ে লাভের হার বাড়ছে। এটা আরও সম্ভব হচ্ছে অর্থনীতির মূল কেন্দ্র ডিজিটাল হয়ে ওঠায়, এবং ভার্চুয়াল পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা বেড়ে যাওয়ায়।

আই এল ও'র হিসাবে বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় ২০০ কোটি মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে। তাই আজ শ্রমের সমস্যা যতটা না কাজের অভাব বা বেকারত্বজনিত তার থেকে বেশি মজুরি কমে যাওয়া বা পতন। যা বৈষম্য, দারিদ্র ও সামাজিক সুরক্ষাকে বীভৎস রূপে প্রকট করেছে।

প্রচুর পরিশ্রম করেও স্বল্প আয়ে সংসার চালাতে না পেরে ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যা এক স্বাভাবিক প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে ভোগ ও লালসার অজস্র হাতছানি ও অপর দিকে স্বল্প মজুরি, এই দুইয়ের টানাপোড়েনে সামাজিক ভারসাম্য ভয়ঙ্কর রকম হিংস্র ও কদর্য হয়ে উঠেছে। হারিয়ে যাচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন মানসিকতা, কারণ একই ছাদের তলায় হাজার শ্রমিকের উৎপাদন পদ্ধতির অস্তিত্ব আজ প্রায় বিলীন। যেখানে জায়গা করে নিচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রিত টুকরো টুকরো এমনতর ব্যক্তিগত অথবা ছোট ছোট পরিসর বা অস্থায়ী নমনীয়তা, যাকে এক অর্থনীতি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কর্মরত কর্মীটি ভাবছেন আর একটু ভালো মজুরি পেলে অন্য কোনও কোম্পানিতে সরে যাবেন। ইউনিয়ন করার দরকার কি! ১৬ কি ১৮ ঘণ্টা যতক্ষণ কাজ করছেন ততক্ষণ মাথায় থাকছে ইনসেনটিভটা বাড়িয়ে নেওয়ার।

ইতোমধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমাদের জীবনের সর্বস্তরেই প্রভাব বিস্তার করেছে। শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞের কাজে নয়, সাধারণ মানুষের দিন যাপনের ছন্দেও। সভ্যতার ইতিহাসে নতুন প্রযুক্তির আগমনে কাজ হারান কিছু মানুষ। এটাই নিয়তি। তবে তা হয় প্রধানত নিচুতলার কর্মীদের ক্ষেত্রে। কাজের বাজারে এই প্রথম দলে দলে কলেজ শিক্ষিতদের কাজ হারানোর উপক্রম ঘটেছে প্রযুক্তির কারণে। এ এক ভুবন জোড়া ফাঁদ। কাজের থেকে ছুটি নেওয়ার সাধ্য নেই, আবার কাজের চাপে জর্জরিত জীবন।

আমাদের দেশেও তথৈবচ, নীতি আয়োগ জানাচ্ছে অর্থনীতিতে শিল্প ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে মিলিত মূল্যযোগ ৮০ শতাংশও সেখানে কাজ করে কর্মরত বাহিনীর ৫৪.৪ শতাংশ অথচ এখানেই যুগপৎ কাজের সংকোচন ও প্রসারণ। অর্থাৎ সাবেক কাজ মিলিয়ে যাচ্ছে নতুন কাজ তৈরি হচ্ছে। এই সময় যে ধরনের কাজের চাহিদা হয়েছে সেগুলি মুখ্যত কমপিউটার নির্ভর ডিজিট্যাল মিডিয়া, সোস্যাল মিডিয়া, স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্র ইত্যাদি। এছাড়া ডেলিভারি বয়, হাতে কলমে বিবিধ পরিষেবা প্রদানকারী শিল্প, বিনোদন শিল্পের অভাবনীয় প্রসার, রিপেয়ারিং মেনটেনেন্স, অটো, টোটো, ওলা-উবেরের মতো পরিবহণ শিল্পে ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে চালক ও সারাই কর্মী এমনতর বিভিন্ন কাজের বাজার ইতিমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। এখানে আইনের যেমন প্রয়োগ নেই, নেই বিধিসম্মত কাজের পরিস্থিতি পরিবেশ, নেই আট ঘণ্টার কাজ। এই নতুন ব্যবস্থায় কোনও শ্রমিক কখনও মালিকদের মুখোমুখি হয় না। কর্পোরেটে নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ এক ভয়ঙ্কর নির্মমতা। আবার এই কাজগুলো অনেক ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে মনুষ্য শ্রমের সংকোচন করছে। আখেরে অর্থনৈতিক যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ ব্যাপক এবং বহুল পরিমাণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্দেশিত, এমন এক স্বয়ংচালিত ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে যে শ্রমে মানুষের প্রয়োজনের অনেক ক্ষেত্রেই কমে আসছে। অথবা নতুন ভাবে সুত্রায়িত হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত ছোট ছোট ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করা গেলেও মানুষের চাষযোগ্য জমি এখনও কমে যায়নি। হয়তো ভবিষ্যতে চালকবিহীন গাড়ির প্রচলনে ড্রাইভারের চাহিদা অনেক কারণে হ্রাস পাবে। কিন্তু ড্যাশ বোর্ডে বুদ্ধিদীপ্ত সজাগ দৃষ্টি রাখার আবশ্যিকতা মনুষ্য শ্রমকে নতুন অভিমুখে পরিচালনা করবে। এইভাবে এক-একটা কর্মের ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় এমনভাবে পরিবর্তন আসছে যার ফলে খুব দ্রুত শ্রমের চরিত্র, প্রয়োজনীয়তার ধরন আমূল পাল্টে যাচ্ছে। বলা যেতে পারে এই মুহূর্তে কর্মরত অথবা কর্মহীন বেসিক ইনকাম, সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্যের অধিকার চলে আসছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ এখন অঢেল, যদিও অধিকাংশ কাজগুলোর স্থায়িত্ব নেই। কিন্তু নতুন কাজের প্রসার কম কিছু নয়। বরং প্রশ্নটা নিযুক্ত কাজের মজুরি কত বা তা কতক্ষণের। এখানেই সমস্যার মূল। কারণ কাজ থাকলেও আইনে কম এবং কাজের নির্দিষ্ট নির্ঘণ্ট বা সীমা নেই। তাই বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আরও গরিব হচ্ছেন। অনেক সময় ধরে এক শতাব্দী সিকি শতক পেরিয়ে যাওয়া মে দিবস বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিল— আমাদের সমস্যার একদম মূলে যেতে হবে। বুঝতে হবে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আমাদের চেতনা, মন, প্রাণ ও শরীরকে কীভাবে বিধ্বস্ত করেছে। জীবনকে পিষে মারছে। এই ব্যবস্থার ওপরেই আগে আঘাত হানতে হবে। বিভিন্ন দেশে দারিদ্র দূরীকরণের নানা কর্মসূচি নেয় বিশ্বব্যাঙ্ক। কিন্তু ওয়াশিংটনে তাদের সদর দফতরেই ১০ বছর ধরে খাবার পরিবেশনের কাজে যুক্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন বেড়েছে মাত্র একবার, তাও নাম মাত্র (৫০ সেন্টস)। কর্মীদের অভিযোগ চুক্তি ভিত্তিক কর্মরত কর্মীদের অনেকেরই বেহাল আর্থিক দশা, নিজেদের অন্নসংস্থানই কঠিন।

আন্তর্জাতিক অর্থনীতির নানা সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে বের করাই বিশ্বব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। যার অন্যতম পৃথিবী জুড়ে বাড়তে থাকা দারিদ্রের মোকাবিলা। বিশ্বব্যাঙ্ক, আই এম এফ সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান আগেই বার বার বলেছে কোভিডকালে বেড়ে যাওয়া আর্থিক বৈষম্য বহু মানুষকে নতুন করে দারিদ্রের অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু বিশ্ব ব্যাঙ্কের খাসমহলের কয়েক শো কর্মী আছেন যাঁরা দারিদ্রের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছেন। বিশ্বজুড়ে শ্রমিক-কর্মচারিদের বেহাল দশা, অথচ সেজন্য তাঁরা দায়ী নন।

বিভিন্ন উন্নতদেশে বহুজাতিক সংস্থায় দেদার ছাঁটাই ও নিয়োগ বন্ধ হওয়ার মতো ঘটনা কোভিড সংক্রমণের আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ভারতেও বহু সংগঠিত আধুনিক প্রযুক্তির উন্নত শিল্পে বিপুল হারে নতুন নিয়োগ হয়েছে। বহু নতুন চালু হওয়া আধুনিক শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পেও নতুন নিয়োগ হচ্ছে না। তার প্রভাব পড়েছে নতুন প্রজন্মের নতুন কর্মী, বিশেষ করে ১৮ থেকে ২৮ বছরের কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে। আধুনিক পরিষেবা ক্ষেত্র ফেসবুকে ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় দফায় ১০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করার কথা ঘোষণা করেছে ফেসবুকের নিয়ন্ত্রক সংস্থা মেটা প্ল্যাটফর্ম। মেটা ছয় মাস আগে গত বছর (২০২২) নভেম্বরে ছাঁটাই করে ফেসবুকের ১১ হাজার কর্মীকে। ১৮ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম একলপ্তে বিশাল সংখ্যক কর্মী ছাঁটাই হয়। বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা এবং ব্যাঙ্ক ও বীমা সহ আর্থিক সংস্থার প্রযুক্তি বিভাগেও চলছে ছাঁটাই।

প্রতিদিন রোদ-ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে বাড়ি বাড়ি ভোগ্যপণ্য পৌঁছে দিয়ে থাকেন এই কর্মীরা। অথচ তাদেরই মাইনেতে বা কমিশনে কোপ। ন্যায্য পাওনার দাবিতে ধর্মঘটে সামিল ব্লিঙ্কইটের কর্মীরা। গত বছর মোট ৪,৪৪৭ কোটি টাকার বিনিময়ে ব্লিঙ্কইটের একটি বড় অংশের শেয়ার কেনে জোম্যাটো। দিল্লির এন সি আর অঞ্চলে ব্লিঙ্কইটের ডেলিভারি কর্মীরা ধর্মঘটে সামিল। তাদের দাবি পুরানো পেমেন্ট সিস্টেম ফেরাতে হবে। আর এই প্রতিবাদের জেরেই দিল্লি-এন সি আর অঞ্চলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জোম্যাটো-ব্লিঙ্কইট-এর ৫০টি দোকান বন্ধ হয়ে আছে। গ্রাহকদের কাছে ভোগ্যপণ্য পৌঁছে দিতে এরা ছুটে চলেছেন বাড়ি বাড়ি। কিন্তু এদেরই প্রাপ্য কমিশনে ডেলিভারি পিছু ১০ টাকা কম দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জোম্যাটো। ধর্মঘটের কারণ বেতন বা কমিশন কমিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদ। জোম্যাটোর এই সিদ্ধান্ত আসলে খরচ বাঁচানো ও মুনাফা বৃদ্ধির কৌশল।

সি এম আই ই-এর বক্তব্য ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের প্রায় পুরোটা জুড়েই দেশে চলা বেকারত্বের মাসিক গড় ছিল ৭.৬ শতাংশ। এর সব থেকে বেশি প্রভাব পড়েছে নির্মাণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষেত্রে। কমেছে কাজে অংশগ্রহণের হার, যা কাজের বাজার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের হতাশার লক্ষণ। একদিকে বড় শিল্পের ঘাটতি অন্যদিকে পুঁজি নির্ভর শিল্পের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীর অভাব শহরে বেকারত্ব বাড়িয়েছে।

বিশ্বব্যাপী নয়া উদারবাদী অর্থনীতি চালু হওয়ার পর থেকেই ধীরে ধীরে কাজের বাজারের চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছে। আট ঘণ্টার কাজ শুধু নয়, কাজের নিরাপত্তা পর্যন্ত নেই।

জার্মানীর অবশিষ্ট তিনটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রও বন্ধ হতে চলেছে

সিদ্ধান্ত হয়েছিল জার্মানী জীবাশ্ম জ্বালানি বা পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিবর্তে আগামী প্রজন্মের জন্য এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার লক্ষ্যে শক্তির বিকল্প উৎস হিসাবে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। পশ্চিমী দুনিয়া সহ সারা বিশ্ব জার্মানীর এই অঙ্গীকার সন্দেহের চোখেই দেখেছিল। সব জল্পনার অবসান করে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের দীর্ঘস্থায়ী প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের জন্য প্রথম ধাপ হিসাবে জার্মানী অবশিষ্ট তিনটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রও অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই উৎপাদন বন্ধ করছে, জার্মানীতে পারমাণবিক উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত এক দশক আগেই নেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলি যথাযথ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চিন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপরই নির্ভর করছে বলে জার্মানীর এই সিদ্ধান্তকে সন্দেহের চোখেই দেখা হচ্ছিল। থ্রি মাইল আইল্যান্ড, চের্নোবিল এবং ফুকুশিমায় পারমাণবিক বিপর্যয়ের পর বিকল্প শক্তি উৎপাদনের জন্য জার্মানীর সরকারের উপর গণ আন্দোলনের চাপ ক্রমশ বাড়ছিল। পারমাণবিক বিদ্যুৎ যে নিরাপদ শক্তি উৎপাদনের উৎস হতে পারে না, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বিরোধী আন্দোলনকারীদের চাপে জার্মানীর সরকার অবশেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আন্দোলনকারীরা এই সিদ্ধান্তকে বিরাট জয় হিসাবেই গণ্য করছে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সমর্থনকারীরা অবশ্য জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে কম দূষণকারী পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে সওয়াল করলেও উপরোক্ত পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে মহাবিপর্যয় থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে সচেতন জনগণ এক দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সরকারকে বাধ্য করল। প্রশ্ন হল উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য দেশ ভারত এবং বিশ্বের সর্বাধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট দেশ ভারতে কোন পথে চলবে? পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ভারতে আন্দোলনরত সক্রিয় কর্মীরা জার্মানীর দৃষ্টান্ত থেকে অবশ্যই উৎসাহিত হবেন।

Vol. 70 Issue No. 29 শনিবার, ২৯ এপ্রিল ২০২৩ আট
RN No. 2710/57 Rupees Five [By Air Rs. 6.50]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

গণবার্তা

Postal Regd. No. SSRM/KOL.-RMS/W.B./R.N.P. 206/2007-09
Licenced to post without pre-payment/Licence No. MM & PO/
SSRM-KOL-RMS/R.N.P. 206/LPWP 042/2007-09

কেন্দ্র ও রাজ্যকে নিশানা আর এস পি'র

২৪ এপ্রিল, বেহাল মহাসড়ক নিয়ে এবার রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হল আলিপুরদুয়ার জেলা আর এস পি'র নেতৃত্বে। সোমবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে মহাসড়ক অবরোধ করে আরএসপি। সকাল ১১টা থেকে পৌনে ১২টা পর্যন্ত অবরোধ চলে। তবে অবরোধে আটকে পড়লেও পরিবহণকর্মী ও যাত্রীরা কোনও অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। কারণ এই বেহাল রাস্তায় তাঁদের ভোগান্তি দিনদিন বাড়ছে।

এদিন যে মহাসড়ক অবরোধ করা হবে, তা ক'দিন আগেই আর এস পি'র তরফে ঘোষণা করা হয়। পুলিশকেও অবরোধের বিষয়টি জানানো হয়। এদিন সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ পলাশবাড়ি বাসস্ট্যান্ডের পাশেই আরএসপি'র নেতা-কর্মীরা অবরোধে সামিল হন। ফালাকাটা থেকে আলিপুরদুয়ারগামী এই রাস্তায় ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের মানুষ বেশি যাতায়াত করেন। তাই দুই ব্লকের নেতা-কর্মীদের জমায়েত করিয়েই ১১টা থেকে রাস্তায় বেঞ্চ বসিয়ে অবরোধ শুরু করে আর এস পি। লাগানো হয় ফ্লেক্স ও পতাকা।

সেখানে সংযুক্ত কিষান সভার জেলা সম্পাদক কম. জ্ঞানেন দাস, আরএসপি'র আলিপুরদুয়ার-১ পশ্চিম লোকাল সম্পাদক কম. নিখিলরঞ্জন বিশ্বাস, ফালাকাটা লোকাল সম্পাদক কম. বিজন দাস বক্তব্য পেশ করেন। তাঁরা জানান, শুরু থেকেই মহাসড়কের কাজ শম্বুকগতিতে চলছে। কাঠের সেতু ও ডাইভারশনগুলি বেহাল। প্রতি বর্ষায় চর তোর্ষা ডাইভারশন ভেঙে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। আর দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে মহাসড়কের কাজই বন্ধ।

আরএসপি নেতা নিখিলরঞ্জন বিশ্বাসের বক্তব্য, 'এই রাস্তা নিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কোনও হেলদোল নেই। আলিপুরদুয়ারের সাংসদ তো প্রতিমন্ত্রীও। তাঁরও কোনও তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। আর জেলা প্রশাসন সব দেখেও কিছুই করছে না।'

শিলিগুড়ি থেকে পণ্য নিয়ে আলিপুরদুয়ার যাচ্ছিল একটি ট্রাক। চালক গৌতম সিং বললেন, এই রাস্তায় সময় বেশি লাগে। কখনও গাড়ির যন্ত্রাংশ বিকল হয়। আমরাও চাই দ্রুত রাস্তার কাজ সম্পন্ন হোক। এজন্য এমন আন্দোলনকে তিনিও সমর্থন করেন বলে জানিয়েছেন। খবর পেয়ে অবরোধস্থলে পৌঁছোয় সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। পরে পুলিশের আশ্বাসে পৌনে ১২টা নাগাদ অবরোধ তোলা হয়।

মহাসড়কের সমস্যা নিয়ে যথারীতি তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি'র তর্জা চরমে উঠেছে। তৃণমূল দোষ চাপাচ্ছে কেন্দ্রের ঘাড়ে। আর বিজেপি'র বক্তব্য স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এবং প্রশাসনিক উদারনীতিই মূল সমস্যা। জেলা আর এস পি নেতৃত্ব রাস্তা মেরামত না হলে ভবিষ্যতে তীব্রতর আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছে।

তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি'র গভীর আঁতাত

১-এর পাতার পর—

অবলীলায় মেতে ওঠেন। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা পর্যন্ত করেন না।

এই সমস্ত ঘটনাবলী মোদি সরকারের জনপ্রিয়তায় বিশেষ কুপ্রভাব ফেলেছে। ফর্জি বা ফেক ডিগ্রীধারী বলে মোদি অভিযুক্ত। তিনি এত দ্রুত পায়ের তলার মাটি নড়ে ওঠার বিষয়টি যথাযথভাবে না বুঝলেও তাঁর একান্ত অনুগত অনুচর অমিত শাহ বেশ বুঝতে পারছেন। ওঁর পেটে তো কিছুটা বিদ্যে আছে বলে শোনা যায়। দীর্ঘদিন যাবৎ বিজেপি সংগঠনের হাল হকিকৎ জানেন। তিনি হয়তো বুঝতে পারছেন যে, ২০২৪ এর নির্বাচনে ২০১৯-এর পুনরাবৃত্তি হবে না। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, কর্নাটক, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে গতবারের মতো বহুসংখ্যক আসনে অনায়াস জয়লাভ সম্ভব হবে না। ফলে ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ এমন কি কেরল রাজ্যেও সংগঠনের নড়বড়ে ভিতকে শক্তিশালী করে তুলতে অমিত শাহ বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। যেন তেন প্রকারে এই কাজ করতেই হবে।

কয়েকমাস আগে কলকাতায় এসে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নবান্নের চোদ্দতলায় বসে গোপন বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে শুধুমাত্র তৃণমূল সুপ্রিমোই সেটিং করেন নি, বিনিময়ে অমিত শাহ, তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন বিজেপির পালে হাওয়া তুলতে যা করার তাই করতে। বামপন্থীদের তাৎপর্যপূর্ণ উত্থান বা পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সর্বত্র তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি পরিত্যাগ করে বামপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত হবার প্রসঙ্গটি অমিত শাহকে বিশেষ উৎকণ্ঠায় ফেলেছে। আর এস এস বা বিজেপি'র কাছে অন্যতম মূল শত্রু তো মার্কসবাদীরা। তাঁরাই তো ভাবাদর্শগত ভাবে মনুস্মৃতির নির্দেশগুলির মোকাবিলা করেন। সুতরাং তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি'র বাধ্য ক্ষমতার দ্বিপাক্ষিক বন্টন অতীব জরুরি। বাজারি টিভি চ্যানেলগুলিকে ব্যবহার করে, আরও অর্থ ব্যয় করে সাধারণের মন থেকে লাল ঝান্ডার প্রতি আকর্ষণ কমানোর উদগ্র চেষ্টা করতে উঠে পড়ে লেগেছে সংঘপরিবারের বাধ্য রাজ্য সরকার। তাঁর বিজেপি বিরোধিতা একটি ছলনা। মানুষকে বিভ্রান্ত করে বিজেপিকে বাঁচিয়ে দেওয়া এই প্রসঙ্গটি রাজ্যের বামপন্থীদের বিশেষভাবে মনে রাখতেই হবে।

নদীয়া জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরে ডেপুটেশন

নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক সাফাই কর্মীদের ন্যায্য বেতন থেকে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের আদেশ অনুসারে ঠিকাদার সংস্থা সাফাই কর্মীদের জন্য ন্যূনতম বেতন সরকারি কোষাগার থেকে তুললেও উক্ত টাকা সাফাই কর্মীদের না দিয়ে আত্মসাৎ করা হচ্ছে।

হাসপাতালের চুক্তিভিত্তিক সাফাই কর্মীদের বকেয়া সহ ন্যায্য বেতন, বকেয়া বোনাস সহ যেভাবে কর্মীদের বঞ্চিত করে সরকারি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে তার তদন্ত দাবি করে ইউ টি ইউ সি নদীয়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আজ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরে বিক্ষোভ ও চার দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

ডেপুটেশনে বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি নদীয়া জেলা কমিটির সম্পাদক কম. সুবীর ভৌমিক, কম. অরুণ নাথ, কম.দিবাকর বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বিদ্যালয় পাঠ্যক্রম থেকে ডারউইন বাদ

আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি

আর এস পি'র কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর উদ্বেগ এবং ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ করছে যে, মোদি সরকার অতি নির্লজ্জভাবে বিশ্বমানব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডারউন এর বিবর্তনবাদের এর তত্ত্ব বিদ্যালয় স্তরের (দশম শ্রেণি পর্যন্ত) পাঠ্যসূচি থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। এ এক অতি জঘন্য ও নিকৃষ্ট প্রকল্প। এমন আধুনিক বিজ্ঞান বিরোধী কর্মসূচি নিশ্চিতভাবে দেশের ছাত্রসমাজের মনন ও চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। বর্তমান ও আগামী প্রজন্ম আরও বেশি কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের চোরাবালিতে নিমজ্জিত হবে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে বেদ পুরাণ বা ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত ভ্রান্ত বিশ্বাস মানুষের মধ্যে বেশি করে প্রবেশ করাতে উৎসুক। আধুনিক বিজ্ঞান এসব অন্ধত্ব স্বীকার করে না।

লক্ষণীয় যে, সংঘপরিবার ধর্মান্ধতা ভিত্তিক বোধের মধ্যে মানুষকে আবদ্ধ করতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভট্টাচার্য মোদি সরকারের নির্দেশে এন সি ই আর টির এভাবে পাঠ্যসূচির অনৈতিক পরিবর্তনের তীব্র নিন্দা করে বলেন যে, মোদি সরকারের এধরনের প্রগতিবিরোধী কর্মকাণ্ড বিগত শতাব্দীর ত্রিশের দশকের জার্মানির ফ্যাসিবাদী হিটলার জমানার ইতিহাস মনে করিয়ে দিচ্ছে।

ওই সময়কালে নাৎসি পার্টির উদ্যোগে জার্মান দেশে সমাজে প্রগতির ধারা অবরুদ্ধ করেছিল। সেই ফ্যাসিবাদের অনুকরণেই ভারতে এক উদগ্র ধর্মান্ধতা অশুভ পক্ষ বিস্তার করে চলেছে। দেশের সংবিধানে বলে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের যে বার্তা স্পষ্টভাবে রয়েছে তা সমূলে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে বর্তমান মোদি সরকার। আর এস পি অবিলম্বে এন সি ই আর টির অবৈধ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে। ২৬.০৪.২০২৩

পানিহাটি সংবাদ

গত ৮ এপ্রিল শনিবার বিকেল ৫.৩০টায় শিক্ষা দফতর-এর চাকরি চুরির দুর্নীতি সহ বিভিন্ন দপ্তরে দুর্নীতি বিশেষ করে পানিহাটি পৌরসভা সহ ৬০টি পৌরসভায় চাকরি চুরির দুর্নীতি সহ পৌর পরিষেবা দিতে ব্যর্থ এবং পানীয় জলের চরম সঙ্কটের প্রতিবাদে ঘোলার মোড় থেকে বি টি রোড পর্যন্ত বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে সুসজ্জিত মিছিল সংগঠিত হয়।

গত ৯ এপ্রিল নাটাগর কদমতলা বাজারে চাকরি বিক্রির দুর্নীতি সংক্রান্ত পৌর পরিষেবার ব্যর্থতার প্রতিবাদে সভা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন লোকাল কমিটির সম্পাদক কম. প্রসেনজিৎ দাস। ১৬ এপ্রিল রবিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় সোদপুর কেয়ার মোড় থেকে পানশিলা পর্যন্ত মিছিল দুর্নীতি সংক্রান্ত ইস্যুতে মিছিল হয়।

গত ২৩ এপ্রিল আগরপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের সামনে থেকে বি টি রোড ধানকল পর্যন্ত দুর্নীতির প্রতিবাদে মিছিল হয়। ৩০শে এপ্রিল রবিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় রেলওয়ের পাঁচ নম্বর গেট উষুমপুর বটতলা বাজারে প্রদক্ষিণ করে দক্ষিণ সুভাষ নগর ও প্রসন্ন চ্যাটার্জী রোডের সংযোগ স্থল পর্যন্ত মিছিল হয়। শিশু শিল্পীদের নিয়ে নৃত্য ও কবিতা পাঠের মাধ্যমে বটতলা বিদ্যাসাগর মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সেখান থেকে সুসজ্জিতভাবে আজাদ হিন্দ নগরে নৃত্যকলা পরিবেশ করে দক্ষিণ সুভাষ নগরে দুর্গা মন্দির স্থলে শিশু শিল্পীদের একক ও যৌথ নৃত্য পরিবেশন করে প্রভাত ফেরীর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

রানাঘাটে লেনিনের জন্মদিবস পালন

সর্বহারা মহান নেতা মহামতি লেনিনের ১৫৪তম জন্মদিবস আর এস পি রানাঘাট লোকাল কমিটির উদ্যোগে আজ সকাল ৯টায় উৎযাপিত হয়।

রানাঘাটের সুভাষ এভিনিউয়ে পৌরসভার সামনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে লেনিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন পার্টির নেতা, কর্মীরা সহ অনেক সাধারণ মানুষ। বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় সফল বিপ্লবের প্রধান কাণ্ডারী লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশে যেভাবে বেকারত্ব, ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে পুঁজিবাদী শোষণে সাধারণ মানুষ জর্জরিত এর প্রতিরোধে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে তীব্র থেকে তীব্রতর করার শপথ নেবার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কম. সুবীর ভৌমিক, কম. ভবানী বর্মন, কম. অঞ্জনা বিশ্বাস প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে লেনিনের স্মরণে গান ও আবৃত্তি পথচলতি মানুষদের আকৃষ্ট করে।

আজ ২৩শে মার্চ আর এস পি'র ছাত্র যুব কর্মীদের উদ্যোগে সকালে রানাঘাট চৌরঙ্গী মোড়ে উৎযাপিত হলো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর বিপ্লবী ভগৎ সিংয়ের আত্মবলিদান দিবস। আপসহীন যোদ্ধা ভগৎ সিং ও তাঁর দুই সহযোগী শুকদেব ও রাজগুরুকে ব্রিটিশ পুলিশ অফিসারকে হত্যা ও সংসদ ভবনে বোমা মারার অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার বিচারের নামে প্রহসন করে ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ ফাঁসি দেওয়া হয়। মৃত্যুর সময় ভগৎ সিংয়ের বয়স মাত্র চব্বিশ বছর।

আপসহীন এই বিপ্লবীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় ও ছাত্র যুব নেতৃবৃন্দ ভগৎ সিংয়ের স্বপ্নপূরণে বৈষম্যহীন সমাজবাদী ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কম. সুদীপ্ত দাস, কম. সুজীব রায়, কম. ভবানী বর্মন প্রমুখ ও দৃপ্ত কণ্ঠে 'বল বীর উন্নত মম শির' আবৃত্তি পরিবেশ করেন কম. রিয়া ধর।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 5/-